অন্ধকারের মধ্যেও সে আলো দেখিতে চায়। সূর্য্য উঠিয়াছে, তবুও এত অন্ধকার কেন? কোন্ কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া দুর্ভাগা বাঙ্গালী আজ কোলের মানুষ চিনিতে পারিতেছে না? কবে এই গাঢ় অস্পষ্ট বাষ্পাবরণ ভেদ করিয়া সমুজ্জ্বল সূর্য্যরশ্মি জগতের নিষ্প্রভ ললাটদেশ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে? প্রভাত হইয়াছে; তাই বাঙ্গালার কুঞ্জভবনে কয়েকটী বিহঙ্গ-নীড়ে বাঙ্গালার চিরন্তন সুরের মধুর কূজন শুনিতে পাইতেছি। এই প্রভাতীগানের আভাষ আমরা প্রবর্ত্তকের কণ্ঠেও প্রচুর পরিমাণেই পাইয়াছি। বাঙ্গালার প্রাণের এই গৌরবময় বিকাশের পথের আবর্জ্জনা দূর করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া অবতীর্ণ প্রবর্ত্তকের সাধু উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের অন্তরের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের দুর্দ্দিনের ঘোর কাটিয়াও কাটে না। কাল-বৈশাখীর কালো মেঘ কুণ্ডলী পাকাইয়া বাঙ্গালীর ঈষৎ-উত্থিত মস্তকের উপর না জানি কি অজ্ঞাত বজ্র উদ্যত করিয়া আছে। বাঙ্গালী অনেক সহিয়াছে, আরও সহিবে! বাঙ্গালী কাঁদিবে, ধূলায় লুটাইবে,—মরিবে না। নবযুগের জগদ্‌গুরু বাঙ্গালীর কাণে মন্ত্র দেন নাই, প্রাণে মন্ত্র দিয়াছেন। সিদ্ধ মন্ত্রের অমোঘ প্রভাবে বাঙ্গালীর প্রাণ অমর হইয়াছে। কিন্তু এই অমরত্ব কেবলমাত্র কায়ক্লেশে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য নহে। বাঙ্গালার প্রাণের এই অপূর্ব্ব প্রস্ফুরণের লীলাতরঙ্গে কোন্ মহাদর্শ ভাসিয়া উঠিবে? ভবিষ্যতের অনিশ্চিত যবনিকাখানি সমুৎসারিত করিয়া, কে বা কাহারা তাহা আমাদিগকে দেখাইবে?

অনেক কাঁটাবন ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালী আজ পথের সন্ধান পাইয়াছে। কিন্তু এ পথও বিঘ্নবহুল—দুর্গম। কি জানি বা অনাগত শঙ্কায় বিহ্বল হইয়া জাতি যদি এই পথে চলিতে ইতস্ততঃ করে, তবে তাহাকে উৎসাহ ও আশার বাণী শুনাইতে হইবে। শাস্ত্রও বলিতেছেন, মুক্তির পথ চিরদিনই ক্ষুরধার-নিশিত। বাঙ্গালীর এই পথিকহীন পথখানিতে কবে মানুষ চলিবে? নবযুগের নূতন মানুষ নবীন আশায় বুক বাঁধিয়া কবে এই পথের যাত্রী হইবে? সে দিন কতদূর?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

৬৮।৫, রসারোড নর্থ, কলিকাতা
"রায় চৌধুরী" এণ্ড কোং হইতে
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
১৪।এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা
"মানসী" প্রেস হইতে
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নারায়ণ

৬ষ্ঠ বর্ষ,—৫ম সংখ্যা] [চৈত্র—১৩২৬

বাঙ্গালার কথা

এই বাঙ্গালা দেশ কাহার ছিল,—কাহার হইতে চলিল? বাঙ্গালার মাটী কি এক উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়াছে। যেখানে এত সহিয়াছে, সেখানে আর সহিতে পারে না।, অসহ্য হইয়াছে। এ উত্তাপ কিসের? বাঙ্গালায় কি আবার ভূমিকম্প হইবে?

মহাশূন্যে ভ্রাম্যমাণ কোন গ্রহ বা উপগ্রহ যদি আজ সহসা কক্ষচ্যুত হইয়া—বাঙ্গালা দেশের উপর নিপতিত হয়,—বাঙ্গালা দেশ যদি আজ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলিমুষ্টির মত উড়িয়া যায়,—বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর অতীত ইতিহাসের সকল প্রকার কীর্ত্তিচিহ্ন যদি আজ বিলুপ্ত হয়,—তবে তাহাতে কাহার কি আসে যায়? বাঙ্গালী কবে কাহার কি করিয়াছে? বাঙ্গালীর জন্য কে কাঁদিবে, কে দুঃখ করিবে? কেনই বা করিবে? বাঙ্গালীর ইতিহাস কেহই জানে না,—বাঙ্গালীও জানে না। যাহার ইতিহাস অজ্ঞাত, তাহার ধ্বংসে মানব-সভ্যতার কি ক্ষতি?—বাঙ্গালার ইতিহাসের অতি সামান্য ভগ্নাংশমাত্রও আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইতিহাসের এই উপাদান অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে,—তাহা আর পাওয়া যাইবে না। যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহার উদ্ধার-সাধন সহজ কথা নয়। তাহা ব্যয়সাপেক্ষ, চেষ্টা-সাপেক্ষ,—সাধনাসাপেক্ষ। যে জাতির মধ্যে তাহার ইতিহাস-উদ্ধারের জন্য চেষ্টার অভাব, অর্থের অভাব,—সে জাতির আশা কোথায়?

আমরা কি ছিলাম, তাহা জানিতে না পারিলে কি করিয়া বুঝিব যে, আমরা কি হইতে চলিয়াছি? আমরা একটা কিছু ছিলাম মহৎ, বৃহৎ—একটা কিছু হইতে চলিয়াছি—উদার বিশ্বব্যাপী;—যাহা কেবল প্রাচ্য নয়,

কেবল পাশ্চাত্যও নয়—অথচ উভয়ের সংমিশ্রণে এমন একটা কিছু,—এই প্রকার অনিশ্চিত অসংবদ্ধ প্রলাপ, আর কতকাল আমাদের চিত্ত হরণ করিবে? আমরা আগে জানিতে চাই যে, আমরা কি ছিলাম।

বাপ-পিতামহের নাম না জানিয়া আত্মপরিচয় দিতে উন্মুখ,—এমন কুলাঙ্গার মনুষ্যসমাজে কে আছে? পৃথিবীতে আজ আত্মপরিচয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠার দিন সমাগত। আত্মপরিচয় সম্পর্কে লোকে বাপ-পিতামহের নাম এখনও অনেকস্থানেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। যদি কাহার কাহার ইহাতে আপত্তি থাকে, থাকুক। তাহাদের কথায় কি আসে যায়? সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ইহাতে আপত্তি থাকিবার কোন কারণ নাই। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ,—অতীতের কোন সংমিশ্রণেই আমরা ভীত হই নাই, ভবিষ্যতেরও কোন সংমিশ্রণে আমরা ভীত হইব না। আজ আত্মপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীকে তাহার পূর্ব্ব পুরুষের পরিচয়টাও জানিতে হইবে। নতুবা পরিচয়ের কোন বিশিষ্টতা থাকিবে না,—প্রতিষ্ঠা পূর্ণতালাভ করিবে না। বাঙ্গালীর যদি মিসর, ব্যাবিলন, বা চীনের মত একটা প্রাচীন সভ্যতাই থাকে, তবে তাহা,—কালে যাহাই করিয়া থাকি না কেন,—আজ আর ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না। বাঙ্গালীকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিতে হইলে,—স্বাধিকার-লাভে প্রমত্ত করিয়া তুলিতে হইলে,—তাহার স্ব-প্রকৃতিকেই অনুসরণ করিতে হইবে। বাঙ্গালীর ইতিহাস-পথে ভ্রমণ না করিলে তাহার স্ব-প্রকৃতির অনুসন্ধান কোথায় সম্ভব ও সার্থক হইবে? কোন জাতিই অন্য জাতির প্রকৃতিকে অনুসরণ করিয়া, অধঃপতন হইতে পুনরুত্থান করিতে পারে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী-চরিত্রই ইহার প্রমাণ। মেকলে সাহেব ইংলণ্ডের ইতিহাস লিখিয়া থাকিলেও বাঙ্গালার ইতিহাস তিনি জানিতেন না। বাঙ্গালী-জাতির চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া, তিনি যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন,—তাহাই এ যুগে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির নিকট বাঙ্গালীর একটা সাধারণ রকমের পরিচয়-পত্র স্বরূপ। সম্ভবতঃ অদ্যাপি ইহা একেবারে অবিশ্বাসযোগ্য বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছে না। আমাদের রাজার সগোত্র একজন অতি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ঐতিহাসিক কেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীচরিত্র সমালোচনা করিতে যাইয়া এমন সব অকথা কুকথা বলিলেন, যাহা মনুষ্যমাত্রেরই অপমান-জনক? সাহেব কি ইচ্ছা করিয়া বাঙ্গালীকে শুধু অপমান করিবার জন্যই ঐরূপ লিখিয়া গিয়াছেন? এই প্রসঙ্গে স্বয়ং

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া, তাহার পর তাহাকে মরা বলিয়া গালি দিয়া লাভ কি? তবে কি বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করিতেন যে, ইংরেজের অধীনে বাস করিয়াই বাঙ্গালীচরিত্র এতদূর পর্য্যন্ত কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে। মোগল-শাসনকালে বাঙ্গালী কিরূপ ছিল? পাঠানশাসন-কালেই বা বাঙ্গালী কিরূপ ছিল? মোগলশাসন অপেক্ষা বাঙ্গালায় পাঠানশাসনের উপর বঙ্কিমচন্দ্র অধিকতর উদারমত পোষণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পাঠানশাসনে কি বাঙ্গালী চরিত্র উন্নতিলাভ করিতেছিল? পাঠানশাসনে বাঙ্গালীর বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র ও বাহুবলের নিদর্শন কোথায়? রঘুনন্দনের স্মৃতি, রঘুনাথের নব্যন্যায়, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রশাস্ত্রোদ্ধার এবং সর্ব্বাপেক্ষা মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও তদঙ্গীয় বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য,—ইহাই কি পাঠানযুগের বাঙ্গালীর বিদ্যা, বুদ্ধি ও চরিত্রবলের নিদর্শন? বাঙ্গালী জমীদারের স্বাতন্ত্র্য ও শাসন যতটা পাঠানযুগে অব্যাহত ছিল, তাহাই কি বাঙ্গালীর তৎকালীন বাহুবলের পরিচয়? বাঙ্গালার যে সমস্ত উৎকৃষ্ট শিল্পজাত দ্রব্য পাঠানযুগেও বাঙ্গালার বহির্বাণিজ্যকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে,—সুসভ্য ইংরেজের অধীনে সুদীর্ঘ দেড়শত বৎসরকাল বাস করিয়াও কি আজ ব্যবসায়ী ও বেশীর ভাগ ইংরাজীনবীশ বাক্‌সর্ব্বস্ব অ-ব্যবসায়ী মিলিয়া চীৎকার করিলে তাহাই ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না? এমন কি, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমেও যে সমস্ত শিল্প ও শিল্পী বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলায় দেখা গিয়াছে, আজ তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদের অনুসন্ধানের বিষয়।

কেন এমন হইল? কে এমন করিল? যাহা ছিল, তাহা গেল কিসে? সে কথা তুলিলে নাকি গরল উঠিবে। আমরা গরল তুলিতে চাই না। কেননা, বাঙ্গালায় নীলকণ্ঠ কেহ নাই। কিন্তু এত যে দলিত, মর্দ্দিত ও মন্থিত হইতেছি, তবু যে অমৃত কেন উঠিতেছে না, কি করিয়া বলিব? শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি, অথচ বাঙ্গালীর পেটে ভাত নাই! বাঙ্গালার নরনারী জঠরানলে পুড়িয়া মরিতেছে। চিতার আগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে!

আমরা কি স্বখাদ-সলিলে ডুবিয়া মরিলাম! আমরা কি নিজের পায়ে নিজেরা কুড়াল মারিলাম! কেন আমাদের এ দুর্ব্বুদ্ধি হইল? আমরা কি আবার বাঁচিতে পারি না? যাহা ছিল, তাহা কি আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না?

এমন সুন্দর দেশ,—এত নদী, নদীতে এমন স্রোত, কাননে এমন শোভা, পক্ষীর কণ্ঠে এমন সুস্বর, আকাশ এমন নীলাভ, এখানে যে বাঁচিতে সাধ যায়। এখানে পশুপক্ষী বাঁচিয়া আছে, মানুষ শুধুই মরিবে কেন?

মানুষ মারে ও মরে। বাঙ্গালী কাহাকেও মারে না, তবু মরে কেন?

সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে বরেন্দ্রভূমি—বঙ্গভূমির যে পুতোজ্জ্বল আলেখ্যখানি, কবি একদিকে প্রজাশক্তি,অন্যদিকে রাজশক্তির বিপুল সংঘর্ষণের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন,—সে ছবি বাঙ্গালীর চিত্তপট হইতে মুছিয়া গেল কেন? বাঙ্গালী গ্রীসের ইতিহাস পড়ে, রোমের ইতিহাস পড়ে। বাঙ্গালী তাহার নিজের ইতিহাস পড়ে না কেন? বাঙ্গালার প্রজাশক্তি কি একদিন অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হইয়া সিংহগর্জ্জনে জল-স্থল-অরণ্যানী প্রকম্পিত করিয়া তুলে নাই? বাঙ্গালার ইতিহাস-বিশ্রুত পালসাম্রাজ্য কি প্রজাবৃন্দের নির্ব্বাচনের উপরেই বহুল পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই? "বাঙ্গালীর এই সাম্রাজ্য কি ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার, কীর ও পাঞ্চাল দেশের উপর বাহুবলে আধিপত্য লাভ করে নাই? সাম্রাজ্যের রণতরীসমূহ কি ভাগীরথী-প্রবাহ আচ্ছন্ন করিয়া সেতুবন্ধ-নিহিত শৈল-শিখর-শ্রেণীরূপে অবস্থিতি করিত না? অসংখ্য মদমত্ত রণকুঞ্জর-নিকর জলদজালবৎ প্রতিভাত হইয়া কি দিনশোভাকে শ্যামায়মান করিত না? উত্তরাঞ্চলাগত বহু মিত্র ও করদ রাজন্যবর্গের উপঢৌকনীকৃত অসংখ্য অশ্ববাহিনীর দ্রুতখুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিপটল-সমাবেশে দিঙ্‌মণ্ডলের অন্তরাল কি নিরন্তর' ধূসরিত হইয়া থাকিত না? বঙ্গসম্রাটের সেবার্থ সমাগত সমস্ত জম্বুদ্বীপাধিপতিগণের অনন্ত-পদাতি-পদভরে বসুন্ধরা কি অবনমিত হইয়া পড়িত না? অসংখ্য পরাজিত শত্রুনরপালগণের মুকুটসমাহৃত স্বর্ণনির্ম্মিত সিংহমূর্ত্তি সমুচ্চ প্রাসাদ-শিখরে সংস্থাপিত হইয়া, গ্রাস-ত্রাস-সন্ত্রস্ত চন্দ্র-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী বিম্বাঙ্করূপী মৃগকে কি পলায়নপর করিবার উপক্রম করিত না? বাঙ্গালার সম্রাট যখন দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন, তখন সেনা-ভারাক্রান্ত বিচলিত পর্ব্বতমালা বক্রভাব প্রাপ্ত হইত; পাতালে বাসুকীর শির সঞ্চালিত, সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত;—বাসুকি মস্তকে বেদনা অনুভব করিত—বেদনা নিবারণের জন্য হস্তোদ্গম করিতে বাধ্য হইত। রাজ-সেনাপতিগণের দিগ্বিজয়-বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র—উৎকলাধীশ অবসন্ন হৃদয়ে রাজধানী পরিত্যাগ করিতেন,—আর প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধীশ্বর রাজাদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া সন্ধি বন্ধন করিতেন। বাঙ্গালীর বিজয়গৌরবে—দাক্ষিণাত্যের শিল্পরুচি অতিক্রান্ত হইয়াছিল, লাটদেশের কমনীয় কান্তি আবিল হইয়াছিল, অঙ্গদেশ

অবনত হইয়া পড়িয়াছিল, কর্ণাটের লোলুপদৃষ্টি অধোমুখে অবস্থিত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল, মধ্য দেশের রাজ্যসীমা সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল।"

ইহা কি সত্য? ইহা কি ইতিহাস? বাঙ্গালায় কি ইহা একদিন সম্ভব হইয়াছিল?

কবি কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। কাব্য কি ইতিহাস? রাজা ও প্রজার সংঘর্ষণ-মূলক যে সকল কথা কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে, সমসাময়িক উৎকীর্ণ লিপি দ্বারা তাহা বহু অংশে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী কাব্য লিখিতে গিয়া ইতিহাস লিখিয়াছেন; ইতিহাস লিখিতে গিয়া কাব্য লিখিয়াছেন। তিনি নিজেই নিজের গ্রন্থের সম্যক পরিচয় দিয়াছেন।

"স্তোকৈস্তোষিত লোকৈঃ শ্লোকৈরক্লেশনশ্লেষৈঃ।
ঘটনাপরিস্ফুট রসৈঃ গম্ভীরোদার ভারতীসারৈঃ॥"

রামচরিত কাব্য হইলেও,—প্রজাশক্তির বিরুদ্ধে রাজশক্তির পুনরভ্যুদয়ের এক সুস্পষ্ট ইতিবৃত্ত। এই কাব্য 'ঘটনাপরিস্ফুটরসে' পরিপূর্ণ। এই কাব্য বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ইতিহাস,—ইতিহাসের এক বড় অধ্যায়। অষ্টম শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশে ভীষণ অরাজকতা ("মাৎস্য ন্যায়") দেখা দিয়াছিল। উৎপীড়িত বাঙ্গালী প্রজাবৃন্দ মিলিত হইয়া গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিল। এই পালবংশের এক রাজা মহীপাল 'অনীতিক' আচরণে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার দুই ভ্রাতা শূরপাল ও রামপালকে কারাগারে আবদ্ধ করেন। বাঙ্গালার প্রজাশক্তি রাজবংশের এই অনীতিক আচরণের প্রতিবাদ করে। কেননা, কনিষ্ঠ রামপাল "সর্ব্বসম্মত" ছিলেন। প্রজার এই প্রতিবাদ বিদ্রোহে পরিণত হয়। বিদ্রোহের ফলে মহীপাল পরাজিত, সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন। প্রজাবৃন্দ কৈবর্ত্তজাতীয় একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে নায়ক করেন। তাহার নাম দিব্বোক। দিব্বোকের ভ্রাতা রুদোক ও ভ্রাতৃপুত্র ভীম যথাক্রমে এই বিস্তীর্ণ পালরাজ্য শাসন করেন। পরে রামপাল পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে সক্ষম হয়েন। এই পালদিগের রাজত্ব সময়ে দেবপাল হিমালয় হইতে বিন্ধ্য, এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত রাজ্যগুলি করপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই দেবপাল উৎকল-কুল উৎকিলিত করিয়াছিলেন, হূনগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন, দ্রবিড় গুর্জ্জরনাথের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন, সমুদ্র-মেখলাভরণা বাঙ্গালাদেশ উপভোগ করিয়াছিলেন। এতবড় একটা বৃহৎ

সাম্রাজ্যের কিসে অধঃপতন হইল? প্রজার সম্মতিতে যাহার অভ্যুদয়, প্রজার অসম্মতিতেই কি তাহা বিনষ্ট হইল? পালসাম্রাজ্যের সিংহদ্বারের সম্মুখে ত সেদিন বখ্‌তিয়ার অশ্ববিক্রয়ের অছিলায়, সতেরটি অশ্ব লইয়া আসিয়া উপনীত হয় নাই। অশীতিপরবৃদ্ধ রাজার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ত রাজকর্ণে কোন আত্মঘাতী ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিধ্বনিত করেন নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীর কুয়াসাচ্ছন্ন প্রভাত ত তখনও অনেক দূরে। তবে কি কোন মোগল পালসাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য হিন্দুকুলাঙ্গার মানসিংহকে বাঙ্গালায় প্রেরণ করিয়াছিল? পালদিগের রাজত্ব সময়েও কি বাঙ্গালায় ভবানন্দ ছিল? অথবা পালসাম্রাজ্যের জীর্ণ দ্বারে ক্লাইব আসিয়া আঘাত করিল, সেদিনও কি মীর-জাফর ছিল? সেদিনও কি বাঙ্গালায় পলাশীর প্রহসন সম্ভব হইত? অথবা রাঢ়দেশের সীমান্ত হইতে পঙ্গপালের মত অসংখ্য অগণিত পদাতিক তীর, ধনু ও বর্ষা হস্তে ধাবিত হইয়া বরেন্দ্রভূমির ইতিহাসবিশ্রুত এই বিরাট সাম্রাজ্যকে এক নিমেষে ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিল? কিসে বাঙ্গালী এতবড় একটা সাম্রাজ্য হারাইল?

সেই সুদূর অতীতে জন্মভূমি বঙ্গভূমি, কবির চক্ষে কি মনোরম প্রতিভাত হইত! কবি মুগ্ধনেত্রে বরেন্দ্রভূমির অনুপম সৌন্দর্য্য চাহিয়া দেখিলেন, আর ভক্তিবিহ্বল চিত্তে জন্মভূমির বন্দনাগীতি গাহিয়া উঠিলেন।

"দরদলিত-কনক-কেতক কান্তিমপ্যশেষ কুসুমহিতাম্।
অরবিন্দেন্দীবরময়-সলিল-সুরভি-শীতল-শ্বসানাং॥"

ইহাই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বের "বন্দেমাতরং" গীতি। বাঙ্গালী হাজার বৎসর এই গান ভুলিয়া গিয়াছিল। আবার কি সে গান গাহিতে পারিবে? আবার কি বাঙ্গালার কবি যুক্ত করে গদগদকণ্ঠে জন্মভূমিকে—সম্ভাবিতাকলুষ-ভাবাং—উপপাদিতব্রতোৎকর্ষাং,—অপরিমিত পুণ্যভূমিং,—সত্যাচারৈক-কেতনং—ব্রহ্মকুলোদ্ভবাং,—গঙ্গাকরতোয়ানর্ম্মপ্রবাহপুণ্যতমাং—অপুনর্ভবাহ্বয় মহাতীর্থ-বিকলুষোজ্জলাং—বলিয়া ডাকিতে পারিবে? যে ভূমির অধিবাসীগণ নানা সদ্‌গুণের আধার ছিল, যেখানে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণেরা বাস করিতেন, যাহার দুই পার্শ্বে গঙ্গা ও করতোয়া এবং মধ্যে অপুনর্ভবা নদী প্রবাহিত থাকায় পুণ্য-তম ভূমি বলিয়া বিবেচিত হইত, আজ বাঙ্গালীর কোন্ পাপে সেই পুণ্যভূমির কপাল পুড়িয়া গেল?

মেকলে যাহাই বলুক,—বাঙ্গালী একটা জগজ্জয়ী ও জগদ্বরেণ্য জাতি ছিল। আজ এই শ্মশান দেখিয়া কি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না? পাল ও সেন রাজাদিগের সময়ে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের যে নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে,—তাহা কি শ্মশানে সোনার প্রদীপের মত জ্বলিয়া উঠিতেছে না? ধীমান ও বীতপাল বাঙ্গালায় পূর্ব্বদেশীয় এক শ্রেণীর অভিনব শিল্পাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা (Founder of "the Eastern School" of Indian Art) বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারেন কি, না—তাহা লইয়া আপাততঃ কিছুদিন তর্ক চলিতে পারে সত্য। কিন্তু পাল ও সেন-রাজাদিগের সময়ের যে সমস্ত প্রস্তর ও ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে বাঙ্গালার একটা বিশেষ শ্রেণীর শিল্পাদর্শ, বঙ্গীয় প্রতিভার সৃষ্টি বলিয়া, নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিতে পারা যায়। কে জানে, বাঙ্গালা, একদিন মগধ ও উৎকলকেও শিল্পাদর্শ দিয়াছিল কি না?

বাঙ্গালী তাহার শিল্পে কিসের আদর্শ সেদিন ফুটাইয়া তুলিয়াছিল? তাহার আকৃতিগত আদর্শের অন্ধ ও নিষ্ফল অনুকরণ-চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া আমরা কি তাহার প্রকৃতিগত আদর্শের সহিত আমাদের আধুনিক প্রকৃতির সাদৃশ্য ও বৈষম্যের তুলনা করিয়া দেখিব না? সহস্র বৎসর পূর্ব্বের শিল্পসাধক—বাঙ্গালীর মনের যে পরিচয় প্রস্তরে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে,—তাহা কি আজ বাঙ্গালীর অনুসন্ধান-যোগ্য নহে? সাহিত্যে, ধর্ম্মে ও সমাজ-বিন্যাসে যে জাতীয় চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গালার স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে তাহা আরও অধিকতর দেদীপ্যমান বলিয়া প্রমাণীকৃত হইবে। সম্প্রতি বারেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির একখানি বিবরণীর মধ্যে আমরা আরও কতকগুলি প্রস্তরে খোদিত দেবদেবীমূর্ত্তির প্রতিলিপি দেখিতে পাইলাম। যতগুলি স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন উদ্ধার করা হইয়াছে,—এ পর্য্যন্ত কেহই তাহা রীতিমত গবেষণা করিয়া শিল্পের এই বিভাগে বাঙ্গালীর প্রতিভার বিশেষত্ব দেখাইতে সক্ষম হন নাই। শীঘ্রই কেহ এই কার্য্যে অগ্রসর হইবেন, এমন আশা করা যায়। কিন্তু আমরা বিশেষজ্ঞ না হইয়াও যতদূর বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতে মনে হয়, বাঙ্গালী যেমন সভ্যতার অন্যান্য বিভাগে, তেমনই শিল্পসাধনাতেও তাহার জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যকে সম্যক ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল। বাঙ্গালার স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে বাঙ্গালীর একটা বিশেষত্ব আছে।

দেবদেবীমূর্ত্তিস্রোতে বাঙ্গালী একদিন ভাসিয়া গিয়াছিল। সেদিন বাঙ্গা-

লার প্রাণে রস ছিল। রস শিল্পসাধনায় মূর্ত্তি পাইয়াছিল। দেখ, দেবদেবী-মূর্ত্তিতে যৌবন কেমন উছলিয়া পড়িতেছে! সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যৌবনের পরিপূর্ণতায় ঢল ঢল করিতেছে! জাতীয় মন তখনও জরাগ্রস্ত হয় নাই। হইলে, শিল্পী কখনও এমন মূর্ত্তি গড়িতে পারিত না। বাঙ্গালার এই দেবদেবীমূর্ত্তি দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়। শুধু চক্ষু নয়—প্রাণও জুড়ায়। এই মূর্ত্তিগুলির দাঁড়াইয়া থাকিবার ভঙ্গী :যদি নিরীক্ষণ কর, তবে :বুঝিতে পারিবে যে, বাঙ্গালী সেদিন পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইতে জানিত। যদি চলিবার ভঙ্গী দেখ, তবে বুঝিতে পারিবে যে, বাঙ্গালী সেদিন পলায়ন না করিয়াও চলিতে জানিত। প্রশস্ত ললাট,—হস্তে বিচিত্র আয়ুধ-বিন্যাস,—চক্ষে উদার সরল দৃষ্টি,—বক্ষে সিংহের সাহস—যে জাতি এই সমস্ত মূর্ত্তি খোদিত করিয়া গিয়াছে—তাহারা কি বাঙ্গালী ছিল? যদি তাহারা বাঙ্গালী ছিল—তবে আমরা কি? আর যদি আমরা বাঙ্গালী হই—তবে তাহারা কে?

বাঙ্গালা, হিন্দু ও মুসলমানে ভাগাভাগি হইয়া যাইবার পূর্ব্বে, অষ্টম হইতে দ্বাদশ—অন্ততঃ এই পাঁচটী শতাব্দীর কথাও যদি আমরা আজ একবার স্মরণ করি,—তবে নিশ্চয়ই দেখা যাইবে যে, গ্রীস ও রোম হইতে যদ্যপি আধুনিক বাঙ্গালীর অনেক শিক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় থাকে, তথাপি, যে বাঙ্গালায় মুসলমান-শাসনে বৈষ্ণব, ও খৃষ্টান-শাসনে ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের জন্ম হইয়াছে, সে বাঙ্গালার পক্ষেও সভ্যতার প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই আদর্শ যোগাইতে পারে, পাল ও সেন-রাজত্ব এমন বিস্তর উপাদানে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

আমরা কি অরণ্যে রোদন করিতেছি? বঙ্কিমচন্দ্র কি অরণ্যে রোদন করিয়া গেলেন? মা যদি ঐ পশ্চিম সমুদ্রের লবণাম্বুরাশির অতল গর্ভেই নিমজ্জিত হইয়া থাকেন, তবে আমরা কি আর মাকে উঠাইয়া আনিতে পারিব না? শস্যশ্যামলা জন্মভূমি—তোমার কোটী কোটী সন্তান আজ এই দীপ্ত চৈত্রমধ্যাহ্নে শুষ্ককণ্ঠ মরণ-আতুর। মা অন্নপূর্ণা! বাঙ্গালী কি আজ একমুঠো ভাতের জন্য এমনই করিয়া ধুঁকিতে ধুঁকিতে মরিয়া যাইবে?

বাঙ্গালী আরও অনেকবার মরিয়াছে। কিন্তু এমনই করিয়া সে বুঝি আর কখনও মরিতে বসে নাই।

আজ বাঙ্গালীর অনেক ভাবিবার কথা আছে। অনেকে অনেক দিক হইতে বাঙ্গালীর কথা ভাবিতেছেন। কেহ বলিতেছেন, ইউনিভার্সিটির শিক্ষা

বন্ধ করিয়া দাও; আইন-কলেজটাকে একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া ফেল। যদি ইংরাজের কাছে কিছু শিখিতেই হয়,তবে বিজ্ঞান শিক্ষা কর; ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রসর হও। কেহ বলিতেছেন, সমগ্র মুসলমান-সমাজে যে সাম্যবাদ বিদ্যমান,—হিন্দুসমাজে তেমনই একটা একাকার-মূলক সাম্যবাদ প্রচলিত না হইলে,—হিন্দুগণ আর কুড়ি বৎসরের মধ্যেই প্রায় নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। সমস্ত বাঙ্গালায় যদি দুই কোটী হিন্দু থাকে, তবে দুই কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ মুসলমান। মুসলমান-যুগেও হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা দশ আনা ছয় আনা ছিল। আজ উল্টা দিকে দশ আনা ছয় আনা হইয়াছে। আজ মুসলমান দশ আনা, হিন্দু ছয় আনা। খৃষ্টান যুগে দুই তিন হাজার লোক ব্রাহ্ম হইয়াছে,—ইহা বিশেষ ভাবিবার কথা নয়। একটা বৃহৎ যুগে, একটা বড় ব্যাপারে অমন সামান্য বাজে খরচ কিছু হইয়াই থাকে। কিন্তু খৃষ্টান যুগে লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান হইয়া গেল কেন? এখনও যাইতেছে কেন? যাহারা মুসলমান হইয়াছে ও হইতেছে, তাহারা কি সকলেই হিন্দু ছিল? যদি তাহারা রীতিমত হিন্দু ছিল না, এই কথাই বলা হয়, তবে মুসলমানগণ তাহাদিগকে টানিয়া লইলেন,—হিন্দুরা তাহাদিগকে টানিয়া লইল না কেন,—এতদিন লয় নাই কেন? ইহা কি হিন্দুদিগের করা সঙ্গত ছিল না? হিন্দুর কাজ হিন্দুকেই করিতে হইবে,—সেজন্য যাহারা "হিন্দু নই বলিতে প্রস্তুত," তাহাদের উপর নির্ভর করিলে ত চলিবে না।

'আমরা সমস্ত হিন্দু এক',—এই রকম একটা কথার প্রতিধ্বনি আমরা ক্রমশঃই সুস্পষ্টরূপে শুনিতে পাইতেছি। দুই কোটী হিন্দুর মধ্যে বাঙ্গালায় এক কোটী এগার লক্ষের জল অনাচরণীয়, তাহারা অস্পৃশ্য। তাহারা শুধু সৎ-ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য নয়। ব্রাহ্মণ যাহাদিগকে শূদ্র বলেন,—রঘুনন্দন যাহাদিগকে শূদ্র বলিয়াছেন,—সেই সমস্ত শূদ্রেরও তাহারা অস্পৃশ্য! এই সমস্ত অস্পৃশ্য জাতিসকলের মধ্যে সুবর্ণ-বণিক আছেন, সাহা-বণিক আছেন,—আবার রাজবংশী আছেন, নমঃশূদ্র আছেন, জেলে কৈবর্ত্ত আছেন। ইহা ব্যতীত আরও বহুতর জাতি আছেন। বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণশূদ্র-ভেদ অপেক্ষা, শূদ্রে শূদ্রে ভেদই অধিকতর মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। অনেক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বলিতেছেন, এই পার্থক্য নিতান্ত কাল্পনিক,—ইহা বস্তুতঃ উন্নতির অন্তরায় নয়। পুরাকালেও এই পার্থক্য বিদ্যমান ছিল;—ইহা অপরিহার্য্য। এ পার্থক্য সত্ত্বেও বাঙ্গালী জাতি উচ্চ আদর্শকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল।

ব্রাহ্মণসভা অন্যদিকে দ্বারবঙ্গাধিপতিকে ডাকিয়া আনিয়া পুনঃ পুনঃ আমাদের কর্ণবিবরে প্রাচীন বর্ণাশ্রমের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। নিতান্ত আগ্রহের সহিত পূর্ব্বজন্ম ও কর্ম্মফলের তত্ত্বকথা শুনাইয়া আশ্বাস দিতেছেন। আদম-সুমারীর বিবরণ পাঠ করিলে মনে হয়, বাঙ্গালার জল-অনাচরণীয়,—এমন কি জল-আচরণীয় জাতিসকলও ব্রাহ্মণসভার পূর্ব্বজন্ম ও কর্ম্মফলের কথা বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেছে না। কিন্তু ইহা শুধু তাহাদের শ্রবণশক্তির দোষ বলিয়া ব্রাহ্মণগণের পক্ষে নিশ্চিন্ত থাকাও কোন ক্রমেই নিরাপদ নয়। ইহারা যদি সকলে মিলিয়া ব্রাহ্ম হইয়া যাইত, তবে আপদ সহজেই দূর হইত। একদিকে থাকিতেন কতিপয় ব্রাহ্মণ, আর দুই কোটী হিন্দুর মধ্যে প্রায় সমস্ত অংশটাই ব্রাহ্মণের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া হইত ব্রাহ্ম। বৌদ্ধযুগের আবার একটা পুনরভিনয় দেখা যাইত। কিন্তু বৌদ্ধদের যে শক্তিসামর্থ্য ছিল, ব্রাহ্মদের তাহা নাই—হইবে না। বৌদ্ধবিপ্লবের পুনরভিনয় কতকটা পাঠান-যুগে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অভ্যুত্থানে দেখা গিয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব যথাক্রমে হিন্দুর বর্ণাশ্রমের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছে। ব্রাহ্ম সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইলেও,—তাঁহারাও তাহাই করিয়াছে ও করিতেছে। জল অনাচরণীয় জাতিগণ ব্রাহ্ম হইতে চাহেন না। তাঁহারা বর্ণাশ্রমের বিরোধী নহেন। কিন্তু যে জাতি যে বর্ণে আছেন, সেই বর্ণে আর তাহারা কিছুতেই থাকিতে প্রস্তুত নহেন। এ ক্ষেত্রে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্ত আলস্যে কালক্ষেপণ করিলে, ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিবে না। ব্রাহ্মণ, পাঠান ও মোগল-যুগেও হিন্দু-সমাজকে ব্যবস্থা দিয়া তাহাকে পরিচালিত করিয়াছে। খৃষ্টান যুগে যদি ব্রাহ্মণ সময়োপযোগী ব্যবস্থা দিতে কৃপণতা করেন,—তবে যে ওলট পালট দেখা দিয়াছে—ইহাতে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। ব্রাহ্মণ নগণ্য তুচ্ছ হইয়া যাইবেন, কায়ক্লেশে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিবেন মাত্র। কিন্তু এরূপ নগণ্যভাবে অস্তিত্বের জীর্ণ ভার বহন করা কি এ যুগের ব্রাহ্মণের পক্ষে শ্লাঘার বিষয় হইবে? নমঃশূদ্র এগার দিনে অশৌচ গ্রহণ করিয়াছেন, উপবীত ধারণ করিয়াছেন,—সংখ্যায় আবার তাহারা দুই এক লক্ষ নহে, অনেক লক্ষ নমঃশূদ্র ব্রাহ্মণকে জল-অনাচরণীয় করিয়াছেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণের ছোঁয়া জল খান না। তাঁহারা বলেন, ব্রাহ্মণগণ কায়স্থের জল খাইয়া ব্রাত্য হইয়াছে। কায়স্থ শূদ্র। আমরা ব্রাহ্মণের জল ব্যবহার করিব না। * * *

ইহা কিসের চিহ্ন? ইহার ভবিষ্যৎ কোথায়? ইহা যদি বাঙ্গালীর ভাবিবার কথা না হয়, ত ভাবিবার কথা কি? বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ, তুমি কি এখনও বুঝিতেছ না? এই আসন্ন সমাজবিপ্লবে কি তুমি পঙ্গুর মত দাঁড়াইয়া থাকিবে? বাঙ্গালা আজ তাহার ব্রাহ্মণের দ্বারে করযোড়ে একটা ব্যবস্থার জন্য দণ্ডায়মান। এমন সুযোগ হেলায় উপেক্ষা করিলে, কে জানে ব্রাহ্মণের ভবিষ্যৎ কোথায়, হিন্দুর ভবিষ্যৎ কোথায়, বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ কোথায়?

তাহার পর অন্নসমস্যা। সকল সমস্যার বড় সমস্যা। সকল প্রকার বীভৎস সামাজিক বিপ্লবের মূলীভূত কারণ এই অন্ন-সমস্যা। সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর কত মতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের চেষ্টার বিরাম নাই। কিন্তু সমস্যা ত দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ, চাউলের রপ্তানী বন্ধ করিবার কথা বলিতেছেন। কারেন্সি আইন শোধরাইয়া দিয়া আংশিক ভাবে দুর্ম্মূল্যতার একটা কারণ দূর করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছেন। কিন্তু সাহেব ও মাড়োয়ারী বণিকের হস্ত হইতে বাঙ্গলাকে রক্ষা করা বুঝি আর গভর্ণমেণ্টের সাধ্যায়ত্ত নহে। মূর্ত্তিপূজা উঠাইয়া দিলে কি চাউলের দাম সস্তা হইবে? জাতিভেদ উঠাইয়া দিলে, বিধবাদের বিবাহ দিলে, কি বস্ত্রের দাম কমিবে? বোধ হয়, বাঙ্গালী আজ সব করিতে প্রস্তুত।

বাঙ্গালার বিশেষতঃ পূর্ব্ববাঙ্গালার একটা বড় ব্যবসা—পাট। পাটের দাম অভাবনীয়রূপে নামিয়া গিয়াছে। এ বৎসর আর পাটের দাম উঠিবে না। বাঙ্গালী পাটব্যবসায়ী মহাজনগণ এবার সর্ব্বস্বান্ত, সম্ভবতঃ আগামী বৎসর একেবারে রিক্ত-হস্তে তাহারা বিশ্বের পথে চিরমুক্ত। স্থানীয় মিলের মালেক সাহেব। সাহেবেরা বাঙ্গালীর হাতে পাট খরিদ করা বন্ধ করিয়াছেন। বাঙ্গালী পাটের মহাজন একে মূর্খ—তাহাতে যৌথকারবার-বিমুখ। কাজেই প্রাকৃতিক নিয়মে তাহারা ঝড়ের মুখে শুষ্ক তৃণের মত উচ্ছন্নের আকাশে উড্ডীয়মান। পাটের ব্যবসার ক্ষতিতে পূর্ব্ব-বাঙ্গালার এক ধনাঢ্য বণিকসম্প্রদায় মরণোন্মুখ। পূর্ব্ব-বাঙ্গালার কৃষক অন্নহীন, বস্ত্রহীন—পথের ভিখারী। পৃথিবীর এতবড় একটা একচেটিয়া ব্যবসা এতকাল যাহাদের হাতে ছিল, তাহারা কতবড় মূর্খ হইলে আজ এমনই করিয়া দেশকে ডুবাইয়া নিজেরা ডুবিতে পারে? কেহ বলিতেছেন—আমাদের দেশের মাটীতে পাট জন্মে, আমরা যদি পাট না বেচি, সাহেবেরা কোথায় পাট পাইবেন, আমরা সাহেবদের পাট বেচিব না। কিন্তু সর্ব্বশেষে দাঁড়ায় এই,—বিড়ালের গলায় কে ঘণ্টা বাঁধিতে যাইবে? আবার কেহ

বলেন,—এবারে বীজের জন্য যত পাটের বীচি আছে—এস, সকলে মিলিয়া তাহা কিনিয়া পুড়াইয়া ফেলি। আগামী বৎসর আর পাটের চাষ হইতে পারিবে না। কাজেই সাহেবেরা আমাদের এই পাট বাধ্য হইয়া কিনিবেন। কেহ বলিতেছেন,—চল, জমীদারের শরণাপন্ন হই। তাঁহারা প্রজাদের ডাকিয়া বলিয়া দিউন যে, আগামী বৎসর কৃষক আর পাটের চাষ না করে।

অন্যদিকে প্রজা বলিতেছে,—আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চাইনা। আমরা সশরীরে গভর্ণমেণ্টের খাস তালুকের প্রজা হইতে চাই। জমীদার অত্যাচারী। জমীদার কৃষি-বাণিজ্যে কোনই সহায়তা করে না। জমীদার বলিতেছেন—যে, নূতন-শাসন-সংস্কারে তাঁহাদের স্থান একেবারেই নাই। এ বড় অন্যায়। জমীদারের স্বার্থ কেহই দেখে না। জমীদারই বাঙ্গালার গৌরব। অতএব চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যেন অনন্তকাল স্থায়ী হয়। ইহা সকলই বাঙ্গালীর ভাবিবার কথা। তাই যুগসন্ধিক্ষণে বাঙ্গালার বিভিন্ন অবস্থান-স্তরে অবস্থিত হিন্দু ও মুসলমান সকল বাঙ্গালীকেই আমরা ডাকিয়া বলিতেছি,—উঠ,—জাগ,—জাগাও। সন্ধিপূজার আর দেরী নাই।

শ্রীঃ—

"বিধবা।"

(১)

তখনও সন্ধ্যা হয় নাই।—অকস্মাৎ গাঢ় তমসায় আমার চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তার পর কি হইল, কিছুই জানি না; এই পর্য্যন্ত মনে পড়ে—কে যেন আমার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে আমাকে অন্য ঘরে লইয়া গেলেন। সুবোধ বাবুও ম্লান মুখে আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন।

সে আজ প্রায় তিন বৎসরের কথা। তাহার এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি আমাকে সহধর্ম্মিণী আসনে স্থান দিয়াছিলেন। তাঁহার নাম—থাক্, সে নাম উচ্চারণ করিতে নয়নে অশ্রু ভরিয়া আসে। তবে এইটুকু বলিতে পারি—তিনি কলিকাতার প্রধান বিচারালয়ের একজন নবীন ব্যারিষ্টার ছিলেন। তাঁহার

সতীর্থ ও বন্ধু শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বসুও তাহাই।—দু'জনের যেন এক আত্মা ছিল।

আমি মাতা-পিতার একমাত্র কন্যা। যদিও আমার একটী সহোদর আছেন, তথাপি মাতার না হইলেও পিতার আমি নয়নের তারা। আমার পিতৃদেবকে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের' প্রায় সকলেই চিনেন। মধ্যে মধ্যে যখন তিনি সমাজের সুধীমণ্ডলীর সমক্ষে "ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা", "স্ত্রীশিক্ষা" প্রভৃতি বিষয়ে জলদগম্ভীর স্বরে বক্তৃতা করিতেন, তখন বিস্ময়বিমূঢ় শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহার বক্তৃতার গৈরিক স্রোতোধারায় ভাসিয়া যাইতেন।

আমি পিতৃদেবের নিকটেই শিক্ষা পাইয়াছিলাম। তাঁহারই আদর্শে আমার জীবনের লক্ষ্য নিরূপিত হইয়াছিল। স্বাধীন ভাবে সর্ব্বত্রই আমার গতি-বিধি ছিল, বন্ধুবান্ধবাদির সহিত একত্র হাস্য কৌতুক এবং আহারাদি করিবার কোনও বাধা ছিল না। পাঁচজনের প্রশংসাদৃষ্টি লাভের জন্য একটু আধটু অনুকরণ করিবার প্রয়াসও ছিল। এমনই করিয়া আশা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়া আমার কৈশোর কাটিয়া গিয়াছিল। আমি শিক্ষিতা। বন্ধুবান্ধবের নিকট—সুগায়িকা বলিয়াও আমার খ্যাতি হইয়াছিল। তাহা ছাড়া যে দেখিত, সেই-ই বলিত, আমি—সুন্দরী। পিতৃদেব প্রত্যহ সন্ধ্যার পর একটী নির্দ্দিষ্ট কক্ষে সকলের সহিত একত্র বসিয়া উপাসনা করিতেন। আমিও তথায় উপস্থিত থাকিতাম। তিনি সেই "অবাঙ্‌মনস-গোচর"কে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেন; কিন্তু আমি পারিতাম না। কি করিব,—তিনি তখন প্রৌঢ়ত্বের প্রায় শেষ সীমায় আসিয়াছিলেন। আর আমি—কৈশোরের গণ্ডী ছাড়াইয়া যৌবন-পথযাত্রী।

ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় লেখা পড়া আমি মন্দ শিখি নাই। সাহিত্যের প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ লেখকের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। তবে সংস্কৃত বিষয়ে সেরূপ না হইলেও কিছু কিছু শিখিয়াছিলাম।

এই সময়ে সুবোধ বাবু ও তাঁহার বন্ধু বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলেন। সমাজে পিতার সহিত তাঁহাদের আলাপ হইল; আলাপ ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হইল। নূতন বন্ধুর সহিত আলাপ পরিচয়ে আমাদের একটানা দিনগুলি আবার সরস হইয়া উঠিল। এই ভাবে দু'মাস যাইতে না যাইতে হঠাৎ এক-দিন প্রাতঃকালে প্রিয়জন কর্ত্তৃক অযাচিত সম্ভাষণরাশিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলাম,—আমাদের মিলন।

(২)

একটী বৎসর কি সুখেই কাটিয়াছিল! তাহার পর সহসা একটা প্রকাণ্ড ঝটিকা আসিয়া আমার সর্ব্বস্ব ধ্বংস করিয়া চলিয়া গেল।—আমি বিধবা হইলাম। সে সময়ের অবস্থা আমার কিন্তু মনে নাই। পরে শুনিয়াছিলাম, —শ্বশুর-মহাশয় সে আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; আর আমার পিতৃদেব গম্ভীর ভাবে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অচঞ্চল পাদবিক্ষেপে তাঁহার সেই উপাসনার গৃহমধ্যে যাইয়া দ্বার-রুদ্ধ করিয়াছিলেন।

আমার বিবাহের প্রায় আটমাস পরে মাতাঠাকুরাণী স্বর্গে চলিয়া গিয়াছিলেন। শ্বশ্রূঠাকুরাণী তখনও জীবিতা ছিলেন। কিন্তু তিনিও পুত্রশোক সহ্য করিয়া বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না; দুই বৎসর পরে তিনিও অনির্দ্দেশ যাত্রা করিলেন। এইখানে বলিয়া রাখি,—আমার দুর্ভাগ্য প্রারম্ভের পর হইতেই প্রায় সর্ব্ব সময়েই আমি শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিয়া আসিতেছি।

শ্বশুর-মহাশয় ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পিতৃদেবের মত লইয়া অবশেষে একদিন তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া দেশ-ভ্রমণে বাহির হইলেন।

বলিতে হইবে না বোধ হয়, শ্বশুর-মহাশয় প্রথমাবধিই আমাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছিলেন। সর্ব্বনাশের দিন হইতে তাঁহার দুইটী কম্পিত বাহু সজোরে আমাকেই যেন আশ্রয় করিয়া রহিল।

আমরা প্রথমে মধুপুর, গিরিডি, প্রভৃতি নানা স্বাস্থ্যকর প্রদেশ ঘুরিয়া বেড়াইলাম; তৎপরে লাহোর, দিল্লী প্রভৃতি ঘুরিয়া গৃহপ্রত্যাগমন-মুখে আমারই নির্ব্বন্ধাতিশয়ে বারাণসীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দশাশ্বমেধ ঘাটের সন্নিকটেই একটী দ্বিতল বাটীর অংশ ভাড়া লওয়া হইল। কথা ছিল, তিন দিনের মধ্যে সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কলিকাতায় ফিরিব। কারণ, প্রায় ছয়মাস হইল, আমরা বাড়ী-ছাড়া।

আমাদের দর্শনোপযোগী বিশেষ কিছুই নাই, দেখিয়া, প্রথম দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গৈবীর জল একটু আস্বাদন করিয়া আসিলাম। দ্বিতীয় দিন প্রাতঃকালে শ্বশুর-মহাশয়ের সহিত দশাশ্বমেধ ঘাটে বেড়াইতে গেলাম। কত নর-নারীর মেলা সেখানে;—কত সজীবতা সকলের মধ্যে। কেহ স্নান করিতেছে; কেহ তাহার ইষ্টদেবের ধ্যান করিতেছে; কেহ

প্রতারণা করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি উপযুক্ত বেশভূষা পরিয়াই বাহির হইয়াছিলাম; তাই অনেকের বিস্ময়দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ হইল। আমিও যেন তাহাতে কেমন একটু সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িলাম।

ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ একটী গেরুয়াবস্ত্রপরিহিতা বালিকার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। আহা, কি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি! কি প্রশান্ত গম্ভীর ভাব!! কেহ যেন মনে না করেন,—বালিকাটী সৌন্দর্য্যের আধার। আধ-ময়লা আধ-ফর্শা বর্ণ তা'র,—পরিধানেও আধ-ময়লা আধ-ফর্শা গেরুয়া বস্ত্র। অঙ্গে কোন অলঙ্কার নাই; মস্তকের কেশরাশি কর্ত্তিত।—ঘাটের একধারে বসিয়া আপন মনে কাপড় কাচিতেছে।

আমি অনিমিষ আঁখিতে দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে কার্য্য শেষ হইল; ধীরে ধীরে বালিকা উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর অবনত মস্তকে বিনম্র পাদক্ষেপে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া অল্পক্ষণ মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি এক-দৃষ্টিতে তাহার পথপানে চাহিয়া রহিলাম। হঠাৎ শ্বশুরমহাশয়ের সুমিষ্ট আহ্বানে চমক ভাঙ্গিল। একটী দীর্ঘনিশ্বাস হঠাৎ হৃদয়মধ্য হইতে বাহির হইল;—বুঝিতে পারিলাম না, কেন দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল। শ্বশুরমহাশয় আর্ত্তভাবে আজ আমার মুখের পানে চাহিলেন কেন?

অন্যমনস্ক ভাবে সে দিন বাসায় ফিরিয়া গেলাম।

(৩)

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর বিশ্রাম করিতেছি; আজ প্রাণে বড়ই শূন্যতা বোধ হইতেছিল। হঠাৎ ঝিয়ের কণ্ঠস্বর কাণে প্রবেশ করিল, "এটা বেহ্ম বাড়ী; এরা কি, সব সময়ে ভিক্ষা দেয়?"

ছুটিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। তখন ভিখারিণী ফিরিয়া যাইতেছিল। ঝিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে?"

ভিখারিণী ফিরিয়া চাহিল।—একি! এ যে সেই বালিকা! কিছু পূর্ব্বে একেই ত দশাশ্বমেধ ঘাটে দেখিয়াছি! চঞ্চল পদে দ্বারের নিকটে গিয়া তাহাকে ডাকিলাম। বালিকা ধীরে ধীরে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া আসিলাম। গৃহমধ্যে যাইতে উদ্যত হইলে ঈষৎ হাসিয়া বালিকা বলিল, "ঘরের মধ্যে যা'ব না; কি বল্‌বে, এখানেই বল।" সে দাঁড়াইল—আমিও দাঁড়াইলাম; দুর্ভিক্ষপীড়িতের মত পলকহীন

দৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। বালিকার বয়স পঞ্চদশ কি ষোড়শ হইবে; কিন্তু অন্তর আমার তাহাকে বালিকা ভিন্ন আর কিছুই বলিতে স্বীকৃত নহে।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। আবার মধুর হাসি। বালিকা বলিল,—"কই, কি বল্‌বে, বল?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমিই কি ভিক্ষা চাহিতে-ছিলে?" সে উত্তর করিল, "আমি ত' জান্‌তাম না—এ বাড়ীতে তোমরা এসেছ?" কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি ভিক্ষা দ্বারাই জীবিকা-নির্ব্বাহ কর?" উত্তর হইল, "আশ্রম-বাসিনীদের তা ভিন্ন আর কি উপায় আছে?"

"এখানে আবার আশ্রম আছে নাকি?"

"হাঁ, কিছুদূরে গঙ্গার নির্জ্জন তীরে একজন সন্ন্যাসীর আশ্রম আছে। আমি সেইখানে থাকি।"

"তিনি তোমার কে?"

"একপক্ষে কেহই নন; কিন্তু তিনিই আমার পিতা, রক্ষক, গুরু—বিধাতা।"

"সেখানে আর কে আছে?

"তাঁর তিন চারিজন শিষ্য আছে; একজন ব্রহ্মচারিণীও আছেন।"

"এত অল্প বয়সে সন্ন্যাসিনী সাজ্‌লে কেন ভাই?"

"হিন্দুবিধবার সন্ন্যাসিনীর সাজই সঙ্গত নয় কি?"

"তুমি বিধবা?"

"হাঁ।"

"আমিও—"

সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল।

সন্ত্রস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা তোমার বাপ মা নাই?"

"আমার শৈশবেই মা গিয়েছেন। আজ প্রায় তিন বৎসর হ'ল, বাবাও আমাকে এখানে রেখে নিশ্চিন্ত মনে বিদায় নিয়েছেন।"

"এই বয়সে এই যোগিনী-সাজ তোমার ভাল লাগে?"

সে গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল, "সংযমই শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।"

আমি স্তম্ভিত ভাবে নিস্তব্ধ হইলাম।

"আর দেরী কর্‌তে পারি না; আমি ফিরে গেলে সকলের আহার হবে।" সে চলিয়া যাইতে উদ্যতা হইল।

চঞ্চলভাবে তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "দাঁড়াও, একটী টাকা আনিয়া দিতেছি।"

বিস্মিত ভাবে আমার মুখপানে চাহিয়া বলিল, "টাকার ত' আমার কোনই প্রয়োজন নাই।"

"তবে—তবে কি চাও?"

"পাঁচ বাড়ীতে ভিক্ষা করি, প্রত্যেক বাড়ীর একমুঠা চালই আমাদের যথেষ্ট।"

"তবে একটা দিন আর পাঁচ বাড়ীতে ঘুরো না; আমিই সব দিচ্চি।" ঝিকে ভাণ্ডার হ'তে চাউল ডাউল আনিতে বলিলাম। কি আশ্চর্য্য! বালিকা তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের এতটুকুও বেশী গ্রহণ করিতে স্বীকৃতা হইল না!

সে বিদায় চাহিল; আমি হাতটী ধরিয়া বলিলাম, "একটী অনুরোধ রাখ্‌বে কি?"

"কি বল?"

"আমরা এখানে নূতন এসেছি; বোধ হয় কালই আবার চলে যাব। তুমি আহারের পর আজ আর একবার দয়া ক'রে আমাদের এখানে আস্‌বে?"

"কেন?"

"আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছে, তোমাদের আশ্রমটী একবার দেখে আসি।"

"আচ্ছা, গুরুদেবকে বল্‌ব, মাকেও তোমার অভিলাষ জানাব। তাঁরা যদি অনুমতি দেন, বৈকালে ঘাট হতে ফিরে যাবার সময় তোমাদের এখানে আস্‌ব।" ধীরে ধীরে সে চলিয়া গেল।

(৪)

শ্বশুরমহাশয়ের বার্দ্ধক্যের একমাত্র অবলম্বন আমি। তাঁহার হৃদয় চিরদিনই স্নেহরসাপ্লুত; সেই স্নেহ এখন আমাকেই বেষ্টন করিয়া আছে। আমি আশ্রম দেখিতে একান্ত উৎসুক; সুতরাং প্রথমে তিনি একটু ইতস্ততঃ করিলেও শেষে আমারই জয় হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তিনি ও আমি সেই বালিকার সঙ্গে আশ্রম দেখিতে চলিলাম।

কেতাবে আশ্রমের কথা পড়িয়াছিলাম। কিন্তু উহা কি রকম, তা' কখন দেখি নাই; দেখিবার প্রয়োজনও ছিল না বলিয়া, জানিবারও চেষ্টা করি নাই। আজ দেখিলাম;—দেখিয়া চমকিতও হইলাম। গঙ্গার তীরস্থিত একটী নির্জ্জন স্থান; চতুর্দ্দিক ঘনতরুগুল্মাচ্ছাদিত; মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর। স্তব্ধ, —গম্ভীর; কাহার যেন অদৃশ্য হস্তে চতুর্দ্দিক সুপরিষ্কৃত। ইতস্ততঃ দুই একটী ধেনু চরিতেছে; দুই একটী আধ-ঘুমন্ত পক্ষীর মৃদুস্বর শ্রুত হইতেছে। সব নীরব;—কাহার মায়ামন্ত্রে আর সমস্তই যেন শব্দহীন।

ধীরে ধীরে আমরা আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখে একটী কুটীর-প্রাঙ্গণ; ক্ষীণ দীপশিখা জ্বলিতেছে। মৃদু শীতল বায়ুহিল্লোলে শরীর স্নিগ্ধ হইল। তাহার সঙ্গে কিসের মধুর গন্ধ বহিয়া আসিতেছিল। বড়ই প্রাণ-মাতান সুগন্ধ;—অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিল।

প্রাঙ্গণের মধ্যস্থিত কুশাসনে একটী প্রৌঢ় সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি; সম্মুখে দুই চারিটী সন্ন্যাসী; দক্ষিণ পার্শ্বে একটী সচল যোগিনীমূর্ত্তি। আমরা স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইলাম। প্রৌঢ় সন্ন্যাসী সাদরে শ্বশুরমহাশয়কে অভ্যর্থনা করিলেন। মধুর হাসির সহিত সস্নেহে সেই যোগিনী আসিয়া আমার হাত ধরিলেন। সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।—বিহ্বল ভাবে তাঁহার পার্শ্বে যাইয়া বসিলাম।

শ্বশুরমহাশয়ের সহিত সন্ন্যাসীর কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। কি বিষয়ের আলোচনা হইল, কিছুই জানি না। আমি পলকহীন দৃষ্টিতে সেই যোগিনীর উজ্জ্বল মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। কয়েক মিনিট চলিয়া গেল। আবার মধুর হাসিতে অধরপ্রান্ত রঞ্জিত করিয়া, যোগিনী আমার হাত ধরিয়া উঠিলেন; প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন, "চল মা, তোমাকে আশ্রম দেখিয়ে আনি।"

ঘুরিয়া ফিরিয়া সমস্ত দেখিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহার কিছু কিছু এখনও পল্লীগ্রামে দৃষ্ট হয়। দুইচারিটী কথাবার্ত্তাও হইল। ফিরিবার সময় যোগিনী বলিলেন, "আমরা নারী, মহামায়ার অংশ;—আমরা জননী। ক্ষুদ্রবৃহৎ, সৎ অসৎ, সকলেরই জন্য আমাদের স্নেহ সঞ্চিত ক'রে রাখা উচিত। প্রত্যেক পদেই কঠিন পরীক্ষা; মা, সে জন্য সংযমই আমাদের প্রধান অবলম্বন।"

প্রায় একঘণ্টা পরে আমরা বিদায় লইলাম। তন্ময় ভাবে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া অনেকক্ষণ নিজ প্রকোষ্ঠে বসিয়া রহিলাম। হঠাৎ ঘড়িতে দশটা

বাজিবার শব্দে চমকিত হইলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি, ঝি দ্রুতপদে আমারই কাছে আসিতেছে। আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই, সে বিরক্তভাবে বলিল, "আজ তোমাদের কি হয়েছে বল দেখি? সেই বেড়িয়ে আসা অবধি কর্ত্তা-বাবু নিজের ঘরে ব'সে হাঁ ক'রে ভাব্‌চেন, তুমিও তাই। বলি, আজ কি আর খাওয়া দাওয়া কর্‌তে হবে না?"

তাই ত'! এখনও শ্বশুরমহাশয়ের আহার হয় নি? ত্রস্তভাবে তাঁহার প্রকোষ্ঠে যাইয়া ডাকিলাম, "বাবা!"

চমকিত ভাবে তিনি আমার মুখপানে চাহিলেন। আবার ডাকিলাম, "বাবা! অনেক রাত হয়ে গেছে যে!"

দ্রুতপদে ছুটিয়া আসিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মা-মা, বল, তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না!"

এইখানে বলিয়া রাখা ভাল, ইতিপূর্ব্বে আমি কখনও শ্বশুরমহাশয়কে প্রকাশ্যে 'বাবা' বলিয়া ডাকি নাই।

তাঁহার প্রশ্নে চমকিয়া উঠিলাম। তাঁহার শিশুর মত ব্যবহারের কারণ বুঝিতে না পারিয়া আমিও মোহাচ্ছন্নের মত বলিয়া ফেলিলাম, "এ জীবনে নয় বাবা!"

একটী আশ্বস্তির নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তিনি বলিলেন, "সংসারে তুমিই এ বুড়ার একমাত্র অবলম্বন, মা!"

আহারের সময় তাঁহার নিকট আব্দার করিলাম;—"এখানে আরও দুই চারিদিন থাকিয়া যাই।" তিনি কোন প্রতিবাদ করিলেন না।

আবার প্রাতঃকালে সেই বালিকার সহিত ঘাটে সাক্ষাৎ হইল। তাহারই জন্য সেদিন খুব ভোরে যাইয়া বসিয়াছিলাম। সহোদরার মত তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম; সাদরে গৃহে লইয়া আসিলাম। উভয়ের মধ্যে কত কথাই হইল।

বৈকালে শ্বশুরমহাশয়কে বলিলাম, "চলুন না, বাবা, সেই আশ্রমে একটু বেড়িয়ে আসি।" সেদিন প্রাতঃকালে তাঁহার একজন বাল্যবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। বহুদিনের পর দর্শন—সন্ধ্যার সময় তাঁহারই গৃহে যাইতে তিনি অনুরুদ্ধ। তিনি বালিকার সহিত আমাকে যাইতে অনুমতি দিলেন।

আবার সেই আশ্রমে আসিলাম। যোগিনী মায়ের মত আমাকে টানিয়া লইলেন। আজ আমি অনেকটা প্রকৃতিস্থ; যোগিনীর সহিত অনেক কথাবার্ত্তা

হইল। দেখিলাম, সেই যোগিনী প্রৌঢ় সন্ন্যাসীরও জননী, আবার তাঁহার শিষ্যদেরও জননী। অনেকদিন হইতে, আমার মাতার অভাব বোধ করিতেছি। আজ তাঁহার সস্নেহ ব্যবহারে আমিও তাঁকে 'মা' বলিয়া ফেলিলাম।

তাহার পর আর চারিদিন কাশীতে ছিলাম। প্রত্যহই সেই আশ্রমে গিয়াছি। একদিন গোপনে যোগিনী ও সেই বালিকার সহিত বিশ্ববিশ্রুত বিশ্বেশ্বরের আরতিও দেখিয়া আসিয়াছি।

৫

দেশভ্রমণ-মানসে যেদিন কলিকাতা হইতে যাত্রা করি, সেদিন মনে একটু সুখ ছিল বটে,—কিন্তু শান্তির একান্ত অভাব ছিল; দেশভ্রমণের পর যেদিন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম, মনে শান্তির উৎস ফুটিয়াছিল,—কিন্তু সুখের একটু অভাব বোধ করিতে লাগিলাম।

আজ সাতদিন হইল, কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছি। তৃতীয় দিনে পিত্রালয়ে যাইয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলাম। সকলে অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার বেশভূষার এ পরিবর্ত্তন কেন?" আমি কোন উত্তর না দিয়া কেবল একটু হাসিয়াছিলাম। পিতা একটু বিমর্ষ হইলেন; আমাকে তাঁহাদের কাছে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। পুনরায় ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলাম "শ্বশুরমশায়ের আমি ভিন্ন সংসারে আর কেউই নাই; তাঁকে ছেড়ে কি ক'রে এখানে থাকি?"

তাহার পর দুইদিন পিতা আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন; দাদাও একদিন আসিয়াছিলেন। আর আসিয়াছিলেন—সেই সুবোধ বাবু, তাঁহার আর একজন বন্ধুর সহিত।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আমি নিজের ঘরে বসিয়া বিদ্যাসাগরমহাশয়ের "সীতার বনবাস" পড়িতেছি। বহুদিন পূর্ব্বে বইখানি একবার পড়িয়াছিলাম; কিন্তু এবারকার মত এত মধুর ত তখন বোধ হয় নাই! দ্বার হইতে শব্দ হইল—"নির্ম্মল!"

চাহিয়া দেখিলাম—পিতা আসিয়াছেন। বইখানি বন্ধ করিয়া উঠিলাম। তাঁহাকে বসিতে বলিলাম; তিনি বলিলেন, "না, আজ আর বস্‌ব না; অনেকক্ষণ এসেছি—তোমার শ্বশুরের সহিত এতক্ষণ গল্প করিতেছিলাম। কাল বৈকালে তুমি একবার আমাদের ওখানে যেও; বিশেষ প্রয়োজন আছে।" ধীর গম্ভীর পদবিক্ষেপে তিনি চলিয়া গেলেন।

শ্বশুরমহাশয়ের সন্ধানে বাহির হইলাম। বৈঠকখানায় তিনি স্তব্ধভাবে একখানি আরাম-কেদারায় বসিয়া আছেন। দেখিলাম, তাঁহার দৃষ্টি উদাস!—

আমি ধীরে ধীরে ডাকিলাম—"বাবা!

আর্ত্তভাবে তিনি আমার পানে চাহিলেন।

সে কি করুণ দৃষ্টি! আমি ব্যাকুল ভাবে বলিলাল "কি হয়েছে বাবা?"

অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"মা-মা, সত্যই কি তুই আমাকে ছেড়ে যাবি, মা!"

চমকিতভাবে তাঁহার মুখপানে চাহিলাম।

"তুমি চলে গেলে আমার কি উপায় হবে মা!"

সন্ত্রস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে বাবা! আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না?"

একবার মাত্র তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখপানে চাহিলেন। তাহার পর আবার কাতর স্বরে বলিলেন, "তোমার বাবার আন্তরিক ইচ্ছা—তুমি আবার সংসারী—"

"কে বল্‌লে?—আমি ত জানি না!"

"তিনিই বল্‌লেন। আজ আমার মতামত জিজ্ঞাসা কর্‌তে এসেছিলেন। তা আমি আর কি বল্‌ব, মা!—তাঁর কন্যা, তাঁরই ইচ্ছা প্রবল।" শ্বশুরমহাশয় অবশ ভাবে চেয়ারে ঢলিয়া পড়িলেন।

আমার হস্তপদ কাঁপিতেছিল। সর্ব্বশরীর শিথিল হইয়া আসিতেছিল। মস্তক অত্যন্ত গুরুভার।—সন্ত্রস্তভাবে পার্শ্বস্থ টেবিলের উপর দেহভার ন্যস্ত করিলাম।

বিহ্বলভাবে তিনি আবার বলিলেন, "আমি বাধা দেবার কে, মা! দুর্ভাগা আমি, তাই তোমাকে সুখী কর্‌তে পার্‌লুম না।"

চতুর্দ্দিকের সমস্ত দ্রব্যই যেন ঘুরিতেছিল। স্খলিত চরণে তাঁহার পদতলে পড়িয়া কম্পিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলাম,—"বাবা—বাবা, কি দোষে আমাকে তাড়িয়ে দিচ্চেন, বাবা! আপনার পায়ের তলায় একটুখানি আশ্রয় দিন আমাকে? আমি আর কোথাও যেতে পার্‌ব না।"

দেওয়ালে স্বামীর চিত্র দুলিতেছিল। সারারাত্রি সেই চিত্রের তলদেশে বসিয়া কাটাইয়া দিলাম। ভগবান! হৃদয়ে শক্তি দাও।

৬

বৈকালে গাড়ী-বারান্দার উপর বেড়াইতেছি। শ্বশুরমহাশয় কোন কার্য্যের জন্য বাহিরে গিয়াছেন। গৃহে আমি একাকী; তাঁহারই প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করিতেছি।—দেখিলাম, অদূরে রাজপথ দিয়া আমার ছাত্রীজীবনের গৃহশিক্ষক যাইতেছেন। আমি সংস্কৃত পড়িতে প্রবৃত্ত হইলে তারিণী পণ্ডিতমহাশয়ই আমার গৃহশিক্ষক ছিলেন। বেহারা দ্বারা তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলাম।

বহুকাল পরে আমাকে দেখিয়া পণ্ডিতমহাশয় অত্যন্ত প্রীত হইলেন। নানা কথার পর তাঁহার পারিবারিক জীবনের কথা উঠিল। জানিলাম—সংসারে তাঁহার পত্নী, দুইটী নাবালক, আর একটী বালবিধবা কন্যা আছেন;—উপার্জ্জনক্ষম কেবল তিনি। তিনি বিদায় চাহিলেন; তখন ধীরে ধীরে সসঙ্কোচে বলিলাম "আমার বড় ইচ্ছা করে, একদিন আপনার কন্যাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনি।"

সবিষাদে একটুখানি হাসিয়া তিনি বলিলেন, "সে যে বিধবা।"

"নিরামিষ পাকেরই বন্দোবস্ত হবে।"

"বিধবা একাহারী। স্বপাকই তাহার শ্রেয়; অভাব পক্ষে মাতা বা শ্বাশুড়ীর সাহায্য গ্রহণ বিধেয়। আর তুমি হয় ত জান না,—বিধবার পক্ষে নিমন্ত্রণ-গ্রহণ বিধিবিরুদ্ধ।"

"কেন,—জাতি যায় কি?"

"বিধবার প্রত্যেক অনুষ্ঠানই সংযম-সাপেক্ষ। মনটীকে নির্ম্মল রাখিবার জন্য আহারে বিহারে নিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন। নিমন্ত্রণে সেটী ত রক্ষা করা যায় না, মা!"

"একদিনে—"

"'নলিনীদলগত—' যা ক্ষতি হবার, এক মুহূর্ত্তেই হয়ে যায়। কিসের দ্বারা কি হয়,—কেউই বুঝ্‌তে পারে না। সেই জন্য পূর্ব্ব হতেই সাবধানতা অবলম্বন করা মঙ্গলজনক।"

তবে কি হবে? আমি শিক্ষিতা বিধবা,—তাই এই বালবিধবাকে দেখিবার জন্য এত আগ্রহ। এঁদের ঘরের এত বাঁধাবাঁধি ত আমি জানি না;—কেউ শেখায় নি যে।

আমাকে বিমর্ষ দেখিয়া পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, "আচ্ছা, তাকে একদিন এখানে নিয়ে আস্‌ব।"

দূরের একটী ক্ষীণ আলোকরশ্মি যেন নয়নপথে পতিত হইল। আমি বলিলাম, "না—না, আমি বরং আপনাদের বাড়ীতে যাব।"

"সে কি, মা!—আমার যে ভাঙ্গা কুটীর!"

"আপনি কেন অত কুণ্ঠিত হচ্ছেন, আমি যাব।"

"মা!"

"কাল নিশ্চয়ই আপনার বাড়ীতে যাব।"

"তবে যেও, মা! দুপুরের পর নিয়ে যেতে আস্‌ব!" ধীরে ধীরে তিনি প্রস্থান করিলেন।

'টুং টাং'—একখানি টম্‌ টম্‌ আসিয়া গাড়ীবারান্দায় থামিল। অল্পক্ষণ পরেই সুবোধবাবু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

শারীরিক-কুশল-প্রশ্নাদির পর একটু ইতস্ততঃ করিয়া তিনি বলিলেন, "সেদিন শরতের সহিত আপনার আলাপ হইয়াছিল। তাকে আপনার কিরূপ বোধ হ'ল?"

একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিলাম, "ভাল লোক।"

"শরৎ আর আমি একসঙ্গেই সিটি কলেজে পড়্‌তাম। রাজেন পড়্‌ত' প্রেসিডেন্সিতে। বি, এ, পাশ ক'রে আমরা বিলাত চলে গেলাম; শরৎ এম, এ, পড়্‌তে লাগ্‌ল। তার পর বি, এল, পাশ করে বিলাত যায়। আজ দুইবৎসর হ'ল ব্যারিষ্টারী পাশ ক'রে এসেছে; এরই মধ্যে সকলের সহিত যেরূপ পরিচিত হয়ে উঠেছে, তাতে শীঘ্রই যে সে উন্নতি লাভ কর্‌তে পার্‌বে, তা' আশা করা যায়।"

"ভগবানের কৃপায় আপনাদের আশা সফল হ'ক।"

"সে এখনও অবিবাহিত। আপনি বোধ হয় সমস্তই শুনেছেন।"

"হাঁ, বাবার মুখে শুনেছি। দেখুন,—আমি বিধবা। ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুরই একটি শাখা। প্রয়োজন হয়েছিল, তাই পাশ্চাত্যভাবে এটী গঠিত হয়েছিল; সে প্রয়োজন যখন সিদ্ধ হয়ে গেছে, তখন বিদেশী অনুকরণ দ্বারা এ অংশটীকে অধঃপতিত না ক'রে, সেই পূর্ণের সঙ্গেই মিলিত হতে দেওয়া সকলের কর্ত্তব্য নয় কি? ধর্ম্মসাক্ষী ক'রে একজনকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করেছিলাম;—কর্ম্মফলের জন্য দুঃখ উৎপন্ন হ'ল। মানুষকে নীরবেই তার কর্ম্মফলভোগ কর্‌তে দিন?"

"আজ একি বল্‌ছেন! প্রতিকারের উপায় থাক্‌তে অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে নীরবে থাকা কি শিক্ষিত সমাজের উচিত?"

"দেখুন, একটী জিনিষ আপনি একজনকে দান করেছিলেন। দু'দিন পরে দেখ্‌লেন—সেটী ধূলায় লুণ্ঠিত হচ্চে। তাই ব'লে কি আপনি সেই দান-করা জিনিষ ফিরিয়ে নিয়ে আবার আর একজনকে দান ক'রে কৃতার্থ হ'তে পারেন? ভগবানের প্রদত্ত নির্ম্মাল্য যতদিন শুকিয়ে ঝরে না যায়, ততদিন সেটী অনাঘ্রাত ভাবেই থাকে।"

"আমিও তবে হিন্দু-শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বলি—বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত।"

"হ'তে পারে,—কিন্তু সেটা ধর্ম্মসম্মত নয়। হিন্দুনারী কি জন্য জগতে বরণীয়া? শাস্ত্রে বোধ করি, তিন প্রকার বিধবা-জীবন উল্লিখিত আছে। —যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যপালনরতা, সংসারে জননীস্বরূপা বিধবা শ্রেষ্ঠ। পুরাকালের সহমৃতা বিধবা অন্যতর; কারণ, তাহারা মনের বলে সন্দিহান হয়েই প্রলোভনপূর্ণ সংসার হতে দূরে সরে যায়। আর যে বিধবা অন্তঃসার-শূন্যা,—যার হৃদয়ে কণামাত্র বল নাই, তাকে অধিকতর পাপ হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্য,—তা'র উচ্ছৃঙ্খল জীবনটী সীমাবদ্ধ কর্‌বার জন্যই পুনঃ-বিবাহের অবতারণা। নারীই সমাজের প্রাণ; কিন্তু বলহীনা নারী বিষধরী; —তাই পুনঃবিবাহ তা'র পিঞ্জর।"

"হিন্দুর পরমারাধ্য বিদ্যাসাগরমহাশয়ের প্রয়াস কি তবে বিপথগামী হয়েছিল?"

"মানুষমাত্রেরই চঞ্চলতা আছে। বিদ্যাসাগরমহাশয়ের হৃদয় নারী অপেক্ষাও কোমল ছিল। নারীর অশ্রু দেখিয়া তিনি বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন; তাই ঐ তৃতীয় বিধি দেশে প্রচার কর্‌বার জন্য অত প্রয়াস পেয়েছিলেন। মনে কর্‌বেন না,—এ সমস্ত আমারই জ্ঞানের ঝঙ্কার। কাশীর সেই যোগিনীর কথা শুনেছেন,—এ সব তাঁরই অগাধ জ্ঞানের ফল।"

"আজ তবে আপনাকে আমার দায়িত্বের কথা জানাই।—জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে রাজেন আমার হাত ধরে বলেছিল, 'অকালে নির্ম্মলার সব অন্ধকার হল; পার ত' তাকে সুখী করো।' শুধু তারই আদেশে শরৎকে আমাদের মধ্যে এনে দাঁড় করিয়েছি।"

"যাতে আমার সুখ হয়, তাই ত' আপনার জীবনের উদ্দেশ্য? পূর্ব্বে

সুখ চিন্‌তুম না,—শান্তিও জান্‌তুম না; এতদিন পরে শান্তি পেতে বসেছি,—কিন্তু কর্ম্মদোষে সুখের অভাব সাম্‌নে এসে দাঁড়াচ্চে। জন্মাবধি পাশ্চাত্যভাবে লালিত পালিত,—পাশ্চাত্য জাতির মত মাতৃস্তন্যপানেও একরূপ বঞ্চিত। চিরকাল বাইরের শোভা নিয়েই ব্যস্ত আছি;—অন্তরে কিন্তু সূচীভেদ্য অন্ধকার জমাট বেঁধে রয়েছে। ক্ষীণ আলোক পেয়েছি; আপনারা যদি সাহায্য করেন, তাকে উজ্জ্বল কর্‌তে চেষ্টা করি। তাই করুন,—তাতেই আমার সুখ।"

"হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী হয়ে চল্‌তে গেলে নারীকে চিরকালই পুরুষের আশ্রয়ে থাক্‌তে হবে। আপনার শ্বশুরমহাশয় বৃদ্ধ; তাঁর অবর্ত্তমানে আপনার অবস্থার কথাটাও ত' ভাবা দরকার?"

"আমার দাদা ত আছেন। আর আপনিও আমার স্বামীর বন্ধু ছিলেন। আমার দুঃসময়ে আপনি কি আমার সহোদরের স্থান নিতে পার্‌বেন না? দাদা আর আপনার চক্ষুর সম্মুখে আমি কি ভেসে যাব? হিন্দুনারী আমি; নারীত্বের সম্মান যাতে রক্ষা হয়, তাইই আপনারা আমাকে শিক্ষা দিন? সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে বাইরন্, সেক্সপিয়র, ড্রাইডেন, স্পেন্‌সার প্রভৃতির সহিত অত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিতা না হ'য়ে, যদি বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি,—অন্ততঃ পক্ষে কৃত্তিবাস, কাশীরাম, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির সহিতও যদি একটু পরিচয় হ'ত! তা' হ'লে বোধ হয়, আজ আমাকে একটুখানি সুখের জন্য—একটুখানি তৃপ্তির জন্য এ রকম ব্যাকুলতা প্রকাশ কর্‌তে হ'ত না।"

সুবোধ বাবু গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত আমার দিকে চাহিলেন। তৎপরে বলিয়া উঠিলেন, "বেশ, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। আজ থেকে তুমি আমার ছোট বন।"

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রণাম

তেতলার ছাদের উপর একখানি মাত্র পূর্ব্বদোয়ারী ঘর; এই ঘরখানি আমার। প্রত্যূষের অরুণরাগ এই ঘরখানিতে সর্ব্বাগ্রে আসিয়া পড়িত। আমি প্রত্যহ ভোরবেলা উঠিয়া দিবসের এই প্রথম অতিথিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম। সম্মুখের খোলা ছাদের উপর মৃগচর্ম্মের আসন-খানি বিছাইয়া, গরদের পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া, কৃতাঞ্জলি-পুটে সেই আরক্ত সৌন্দর্য্যের প্রতীক্ষায় অনিমেষ চাহিয়া থাকিতাম। অল্পে অল্পে পূর্ব্বদিক প্রসন্ন হইয়া আসিত, অল্পে অল্পে স্বর্ণচ্ছটা ফুটিয়া উঠিত, দেখিতে দেখিতে মেঘে মেঘে সিন্দূর-সমুদ্র টলমল করিয়া উঠিত; আমার কম্পমান বুকখানা দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া একাগ্র চক্ষে চাহিয়া থাকিতাম,—কখন আসে, কখন আসে। মনে হইত, এখনই আমার সমস্ত হৃদয়-মনে স্তবগান ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিবে; কিন্তু একটি মন্ত্রও উচ্চারিত হইত না। তাহার পরে ধীরে ধীরে সেই অপ্রসমুজ্জ্বল কুঙ্কুমরাশি ভিন্ন করিয়া ঢল ঢল স্বর্ণকমল ফুটিয়া উঠিত। আমি সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বারম্বার প্রণাম করিতাম।

এই সূর্য্য, এই জগতের আলো, এই মহিমাময় মহাদ্যুতির সম্মুখে আমার শির স্বতঃই নত হইয়া পড়িত। প্রত্যহ তাঁহারই আলোকে স্নান করিতাম, তাঁহারই কনককিরণে হৃদয়ান্ধকার দূর করিতাম, তাঁহাকে প্রণাম করিতাম, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতাম, তাঁহারই উদ্দেশে কুসুমাঞ্জলি নিক্ষেপ করিয়া মহা-নন্দে নিমগ্ন হইতাম। এমনই করিয়া আমার দিন কাটিত। আর কাহারও প্রতি আমার ভক্তি ছিল না। মনে হইত, এই আমার সত্য, এই আমার ধ্রুব, এই আমার চিরজীবনের একমাত্র অনির্ব্বাণ আলোকশিখা; এই অসীমসুন্দর মহাবিকাশকে ত্যাগ করিয়া কোন্ অলক্ষ্য, অজানার উদ্দেশে অর্ঘ্য বহন করিয়া বেড়াইব? যাঁহার জ্যোতির্ম্ময় কনকসূত্রে আমার হৃদয়খানি বাঁধা পড়িয়াছে, সারাদিন তাঁহারই স্তবগানে অতিবাহিত করিতাম। তাহার পর সন্ধ্যাবিদায়ের প্রসন্ন আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া ঘরে ফিরিতাম। আমার নিদ্রা সোনার স্বপ্নে মগ্ন হইয়া থাকিত, আমার জাগরণ কুঙ্কুমস্রোতে সাঁতার কাটিয়া বেড়াইত;—এমনই করিয়া আমি অরুণ-লোকের অধিবাসী হইয়া গিয়াছিলাম।

হঠাৎ একদিন আমার আকাশে দ্বিতীয় সূর্য্যের উদয় হইল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে গোটাকতক কথা বলিয়া লওয়া আবশ্যক।

এক বৎসর হইল, আমার লেখাপড়া শেষ হইয়া গিয়াছে। আমার পিতা জজ; মা বর্ত্তমান; কাজেই নানাদিক হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছিল। কিন্তু আমার হৃদয়ে তখন কোন মানব-কন্যার স্থান ছিল না।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন রে বসন্! তা হ'লে সব ব্যবস্থা করি?

আমি বলিলাম—এখনই কেন মা, যাক্ না কিছুদিন। মা বোধ হয় মনে করিলেন, এটা আমার লজ্জা। তিনি উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

কাহারও সহিত বেশী কথা কওয়া আমার স্বভাব নয়, এমন কি মায়ের সঙ্গেও।

সেদিন সূর্য্যোদয়ের তখনও বিলম্ব আছে। আমি প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া স্বপ্নসমাহিত অবস্থায় ছাদের উপর বসিয়া আছি। আজ পূর্ব্বাকাশে আলো ও আঁধারের সংমিশ্রণে স্বর্গোদ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে। অশোক, কিংশুক আর রক্তজবায় সে বাগান ছাইয়া গিয়াছে। হায়! এ সৌন্দর্য্য ক্ষণকালেই মিলাইয়া যাইবে। অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া সেই অপরূপ শোভা হৃদয়ে আঁকিয়া নিলাম। তাহার পর চক্ষু নিমীলিত করিয়া অন্তরের মধ্যে পূর্ব্ব-গগনের প্রতি-কৃতি দেখিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, এবার চোখ খুলিয়াই একেবারে আমার দেবতাকে দর্শন করিব।

ক্ষণকাল চক্ষু মুদিয়া থাকিবার পর মনে হইল, সূর্য্যোদয় হইয়াছে। নিমী-লিত চক্ষেই করজোড়ে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তাহার পর ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া,—একি দেখিলাম! তুমি কে গো! আমার গগনে এ আজ কোন্ সূর্য্যের উদয় হইল! তেমনই দীপ্ত তোমার মুখখানি, তেমনই রক্তরাগ তোমার কপোলে, তেমনই উজ্জ্বল তোমার মধুবর্ষী দৃষ্টি দূর-দিগন্তের দিকে প্রসারিত। ঐ যে তোমার দু'খানি ললিত করতল যুক্ত হইল, ঐ যে তোমার দৃষ্টি পূর্ব্বাকাশের দিকে ফিরিল, ঐ যে সূর্য্যোদয় হইতেছে। তুমি সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিতে চাও, কিন্তু তোমার করপুট ললাট পর্য্যন্ত উঠিবার পূর্ব্বেই তোমার প্রণাম শেষ হইয়া গেল। তুমি চলিয়া যাইতেছ? ওগো আমার অরুণ-লোকের সহযাত্রিনী! কিন্তু ছিঃ, আজ আমার এ কি হইল! হে সূর্য্যদেব, ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর। প্রণাম, তোমায় প্রণাম, তোমায় প্রণাম!

কিন্তু তবুও ক্ষণে ক্ষণে মনে হইতে লাগিল, সেই মুখখানি, সেই চোখদু'টি,

সেই দু'টি কোমল করপল্লব। দেবলোকের সেই জ্যোতিরুৎসবের মাঝখান হইতে আজ এই প্রথম আমি পৃথিবীর পানে তাকাইয়া দেখিলাম; শ্যামা, সুন্দরী, প্রাণময়ী এই পৃথিবী। কোথাকার অজ্ঞাত নির্ঝরিণী টুটিয়া অকস্মাৎ প্রাণের প্রবাহ ছুটিয়া আসিল, প্রবল তরলবেগে এক নিমেষে আমার নব-জীবনের বেলাভূমি উত্তীর্ণ করিয়া দিল। অজানা দেশের নূতন পথিকের মত উৎসুক বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম—দূরে ঐ গাছগুলি। কে জানিত, তাহাদের পাতার কাঁপনে এমন সজীব আদর,—এমন স্নেহের আহ্বান লুকান ছিল। প্রথম প্রভাতের এই কলকণ্ঠ পাখীগুলি—এরা যেন স্নেহময়ী প্রকৃতির মায়ামন্ত্র ঘোষণা করিবার ভার লইয়াছে। এই বাতাসের স্পর্শ, এই কুসুমরাশির গন্ধ, আমার মুগ্ধ হৃদয়কে নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল। এ যেন নূতন আশার আনন্দ, আবার তাহারই সঙ্গে কিসের একটু অস্ফুট বেদনা; কিসের যেন আশ্বাস, আবার তাহারই মধ্যে লুকানো একটু দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু এই আশা-নিরাশার, আনন্দ-বেদনার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় কেন? আমার একনিষ্ঠ চিত্তের মধ্যে একি বিরোধ ঘনাইয়া উঠিল? মনে হইল, আমার দেবতা যেন অতিরিক্ত উজ্জ্বল, অতিরিক্ত ভাস্বর। এতটা দীপ্তি আমার মানব-চক্ষে একটু যেন দুঃসহ। কিন্তু সেই মানব-নন্দিনীর কান্তিচ্ছটা!—হায়! তবে কি আমি দেবতার কাছে অপরাধী হইলাম? কেন? এমন কি অপরাধ? এই কন্যা কুমারী, আমি কুমার। নবজীবনের এই প্রথম প্রভাতে, নীলাকাশের আশীর্ব্বাদের নীচে দুইখানি তরুণ হৃদয় একই কালে, একই দেবতার চরণতলে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে,—ইহাতে অপরাধ কোথায়? আমার পূজামন্দিরে দেবতার আরতি করিতেছিলাম আমি একা,—আজ হইতে না হয় আমরা দুজনে,—আমরা! কে তিনি, কি তাঁর নাম, কিছুই ত জানি না। নাই বা জানিলাম। সূর্য্যকিরণের সেতুর উপর বাসরগৃহের পুষ্পচন্দন যদি না পড়ে, তাহাতে আক্ষেপ কি?

তিনি কে?—এটা ত এখনই জানা যাইতে পারে। ঐ ত তাঁহাদের বাড়ী। কিন্তু কি হইবে জানিয়া? শেষে দুঃখকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিব! কি তাঁহার নাম? লীলা, কি শোভা, কি এমনই একটা কিছু হইবে। কিন্তু কোনটাই তাঁহার উপযুক্ত হইল না তো। প্রভা, মন্দা, সরযূ, কমল,—না; তাঁহার যোগ্য নাম পৃথিবীর ভাষায় আজিও সৃষ্টি হয়

নাই। তবু একটা নাম চাই; আচ্ছা সূর্য্যমুখী? নাঃ—একটু কঠোর হইয়া পড়ে। তবে ঊষা?—এটা বরং মন্দ নয়। নয়নের আনন্দ, পূর্ব্ব গগনের প্রথম আলো, ধ্যানমৌন পূজারীর জাগ্রত স্বপ্ন।

এমনই করিয়া কিছুকাল কাটিয়া গেল। প্রতি প্রভাতে সূর্য্যবন্দনার মাঝখানে ক্ষণকালের জন্য একখানি কিশোরী প্রতিমা ফুটিয়া উঠিত এবং সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ঊষারাণীর মত মিলাইয়া যাইত। এই অল্প একটু সময়ের মধ্যে তাঁহার উৎসুক দৃষ্টি আকাশের নানাস্থানে বিচরণ করিত। কিন্তু আমাদের এই পশ্চিমদিকের ছাদের পানে একবারও তাঁহার নয়ন পড়িত না। এটা যেন নিষিদ্ধ দিক; এদিকে যেন এমন কিছু আছে, যাহা দেখিবার জন্য কোন কিশোর হৃদয়ে কোন কৌতূহলই জাগে না।

আহারে বসিয়াছি। মা আমার কাছে বসিয়াছেন। হঠাৎ মা বলিলেন—"হাঁরে বসন্! ভুনি বল্‌ছিলো, ওদের ননীবালাকে নাকি তোর পছন্দ হয়েছে? ছাখ্, বলিস্ তো ওদের বাড়ী ঘটক পাঠাই।"

"সর্ব্বনাশ! ননীবালা! মা, আমি শপথ ক'রে বল্‌তে পারি, তোমার ননীবালা, কিম্বা শশীমুখীকে কোনকালে আমি পছন্দ কর্‌তে যাইনি।"

আহার শেষে আমার তেতলার ঘরে গিয়া ভাবিলাম—হঠাৎ কথাটা ব'লে হয় তো ভাল কর্‌লুম না। এই ননীবালাই যদি ঊষারাণী হয়!

হঠাৎ একদিন তাঁহাদের বাড়ী বিবাহের বাদ্য বাজিয়া উঠিল। চতুর্দ্দোলে চড়িয়া, ব্যাণ্ড বাজাইয়া বর আসিল। অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমার বুক থর থর কাঁপিয়া উঠিল। আমাদের বাড়ীর নিকট দিয়া এমন কত বর যায়, কত বর আসে, কখনও তাহাদের শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য উদ্বিগ্ন হই নাই। কিন্তু আজ এই বরটিকে দেখিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। দেখিলাম, রাজার মত পোষাক পরিচ্ছদ পরাইয়া খাড়া করিয়াছে এক রকম মন্দ নয়। ননীবালা নামধারিণী কোন কিশোরীর উপযুক্ত বর সন্দেহ নাই। কিন্তু ননীবালাই যদি ঊষা হয়!

পরদিন বরকন্যা বিদায়ের সময় ভিড়ের মধ্যে আমাকে উপস্থিত দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইয়াছিল। আমার কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। কিছুক্ষণ পরেই বরকন্যাকে বাহিরে আনিয়া পত্রপুষ্পে সাজানো মোটরের উপর চড়ানো হইল। আমি ভিড় ঠেলিয়া কোন গতিকে একবার কন্যাটিকে দেখিয়া লইলাম।

আঃ—বাঁচা গেল। এ তো ঊষা নয়। যাক্, এখন নিশ্চিন্ত মনে তেতলায় গিয়া উঠিতে পারি।

বাড়ী গিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—মা, ওদের বাড়ী কা'র বিয়ে হ'ল?

মা বলিলেন—ও সেই ননীবালার বড় বোনের। তুই তো আর বিয়ে টিয়ে কর্‌বি নে, নইলে ননীবালা মেয়েটি দেখ্‌তে শুন্‌তে বেশ, দিব্যি চালাক চতুর, আর এদিকে—

আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না। বুঝিলাম, এই ননীবালাই ঊষারাণী।

প্রতিদিন আমার সূর্য্য-আরাধনা চলিতে লাগিল। ধীরে ধীরে আমার হৃদয়ে ঊষারাণীর স্বর্ণসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু সিংহাসনের অধিকারিণী কোনদিন পলকের জন্যও সেদিকে নয়নপাত করিলেন না। হায়, দীর্ঘদিবা, দীর্ঘরজনীব্যাপী ব্যাকুল প্রতীক্ষার পর একটিমাত্র শুভক্ষণ ভাসিয়া আসে, তাহাও অনাদরে অবহেলায় ব্যর্থ হইয়া যায়। অথচ এমনতর মুহূর্ত্ত আর কতগুলিই বা বাকী আছে।

আবার একদিন ভোরবেলা হইতে তাঁহাদের বাড়ী সানাই বাজা আরম্ভ হইল। স্পষ্ট বুঝিলাম, প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বিসর্জ্জনের পালা আরম্ভ হইয়াছে। আজিকার সূর্য্য মেঘে ঢাকা, সমগ্র পূর্ব্ব-গগনে অশ্রুবাষ্প ঘনাইয়া উঠিয়াছে। মৃগচর্ম্মের আসনে বসিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। আমি ছাদের উপর পায়চারী করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

চকিতে সেই পরিচিত প্রতিমাখানির উদয় হইল। ক্ষণকালের মধ্যে পূর্ব্বাকাশে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল,—সূর্য্য নাই। তাহার পরেই একেবারে আমার দিকে চাহিয়া,—আমাকে? এ কি গো, কাহাকে তুমি প্রণাম করিলে? আজ কি পশ্চিমে সূর্য্যোদয় হইয়াছে? আজ কাহাকে ধন্য করিলে তোমার স্নিগ্ধ দু'টি নয়নপাতে? কাহার চক্ষে আঁকিয়া দিলে তোমার ঐ লজ্জারুণ-প্রণত মিনতিখানি? বিসর্জ্জনের বিদায়-রাগিণীর মাঝখানে, ক্ষণিকের লীলায় এ আগমনীর সুখটুকু কেন গাঁথিয়া দিলে? হায় গো! তোমার ঐ ভাষাহীন বিদায়-বাণী দু'টিদিন আগে যদি শুনিতে পাইতাম; যদি আভাসেও বুঝিতাম, এই তৃষাতুর পশ্চিমের পানে কাহারও দু'টি শিশিরসিক্ত কমলদৃষ্টি গোপনে ফিরান আছে,—

রাত্রে বাইশ ঘোড়ার গাড়ীতে চাপিয়া রণবাদ্য বাজাইয়া বর আসিল। এবার আমার বর দেখিবার ইচ্ছা হইল না। বাদ্যের ঘটা শুনিয়াই বুঝিতে পারিলাম, এই দিগ্বিজয়ী বীর কন্যাপক্ষের কেল্লা ফতে করিয়া যাইবে। হঠাৎ একবার মনে হইল, বীরবরের সঙ্গে একবার লড়াই দিয়া দেখি। কিন্তু আন্দাজে বুঝিলাম, তাঁহার সেনাসংখ্যা অগণ্য। পরাজয় নিশ্চয় জানিয়া ক্ষান্ত হইয়া বসিয়া রহিলাম।

যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই। পরদিন বিনাযুদ্ধে, বিনাবাধায় দুর্গ দখল করিয়া বিজয়ী বীর জয়োল্লাসে আকাশ বাতাস বিকম্পিত করিয়া চলিয়া গেলেন।

সূর্য্য অস্ত গেল। এখন শুধু অন্ধকার, শুধু অন্ধকার। এই প্রলয়ান্ধকারের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কোথাকার পাগল কৃতাঞ্জলি হইয়া অপেক্ষা করিতেছে,—কবে আবার প্রভাত হইবে, কবে তার সূর্য্য উঠিবে, করে সে তাহার কুড়াইয়া-পাওয়া প্রণামখানি ফিরাইয়া দিয়া যাইবে।

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেন।

ভুবনেশ্বরের ভাস্কর্য্য ও উড়িষ্যার শিল্পকলা

ভাবুক ও সাহিত্যশিল্পী ৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর-মহাশয় তাঁহার উড়িষ্যার দেব-ক্ষেত্র নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "ভুবনেশ্বরের দেওয়ালে কতকগুলি উন্নতগ্রীবা দীর্ঘাবয়বা রমণীমূর্ত্তি এমনি ইউরোপীয় ছাঁচে ঢালা—বোধ হয় এবং কোন কোনটির ভঙ্গী এমনি ইউরোপীয় যে, গ্রীকপ্রভাব অস্বীকার করিতে বিস্তর চেষ্টার আবশ্যক করে। বিশেষতঃ যখন পার্ব্বতীমূর্ত্তিসন্নিহিত নিভৃত কোণে কলানিপুণা রমণীগণের মধ্যে সহসা গ্রীসীয় 'লায়র' (Lyre) যন্ত্রহস্ত নারীমূর্ত্তি দেখা যায়, তখন চমকিয়া উঠিতে হয়, এ কি গ্রীস না ভারতবর্ষ?"

রাজা রাজেন্দ্রলাল তন্ন তন্ন করিয়া লিঙ্গরাজ-মন্দিরের কারুকার্য্য ও প্রস্তর-খোদিত চিত্রাদি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি অমরাবতীর বৌদ্ধস্তূপে 'হার্প' (harp) যন্ত্রের চিত্রের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ভুবনেশ্বরে এক বীণা ব্যতীত তারসংযুক্ত অপর কোনও বাদ্যযন্ত্র দেখা যায় না। (১)

(১) Mitras Antiquities of Orissa, vol 1, P. 113

সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের এক শ্রেণীর মুদ্রায় যে বীণার চিত্র দেখা যায় (২), তাহা ইউরোপীয় লেখকগণ ভারতীয় হার্প বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল কাত্যায়নের 'কল্পসূত্রে' বর্ণিত শততারযুক্ত একটী বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন (৩)। বলেন্দ্রনাথ-কথিত বাদ্যযন্ত্র এই প্রকার হার্প হইতে পারে না কি? আমরা এ মূর্ত্তিটি আছে কি না লক্ষ্য করি নাই। একটিমাত্র লায়রাকৃতি যন্ত্র দেখিয়া গ্রীকপ্রভাব অনুমান করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা আবশ্যক। গ্রীক শিল্পিগণের প্রভাব গান্ধারের গ্রীকবৌদ্ধ শিল্পে সুপরিস্ফুট বটে এবং ১৯০৮-৯সালে কনিষ্কস্তূপে বুদ্ধ-দেহাবশেষের যে ধাতুনির্ম্মিত আধার বা 'শরীর-নিধান' আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও অগিশল নামক জনৈক গ্রীক কর্ম্মপরিদর্শকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (দস অগিশল নবকর্ম্মি কনস্কস বিহরে মহসেনস সংঘরমে)। (৪)

কনিষ্কের রাজত্বকাল ৭৮ খৃঃ অব্দ হইতে ১২০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অনুমিত হইয়াছে (৫)। সুতরাং খৃঃ ১ম ও ২য় শতাব্দীতে যে গ্রীক শিল্পিগণ কুষণ-বংশীয় নরপতিদিগের অধীনে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কার্য্য করিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। শ্রীযুক্ত ডাঃ গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইউরোপীয় মনীষীদিগের মত সযত্নে আলোচনা পূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে, ভারতে গ্রীকশিল্পী-নিয়োগ খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী হইতে খৃঃ প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্তই অধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল (৬)। আধুনিক অভিজ্ঞগণের মতানুলম্বনে ভুবনেশ্বরের মন্দির যদি দশম বা একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে নয় শত বৎসর পরে গ্রীক শিল্পরীতি কিরূপে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে দক্ষিণপূর্ব্ব সীমান্ত পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহা বিশেষ-অনুসন্ধান-সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। সুধীবর্গের মধ্যে যাঁহারা গ্রীকপ্রভাব অস্বীকার করেন না—তাঁহারাও বলিয়াছেন যে, হূন আক্রমণের পর যুনানী শিল্প-রীতির প্রতিপত্তি খৃঃ ৪০০ অব্দ হইতেই লুপ্ত হইয়াছিল এবং খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দী

(২) প্রাচীনমুদ্রা, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, পৃঃ ৮৮

(৩) Mitras Antiquities of Orissa, p. 113, vol 1.

(৪) Dr. Spooner's paper on the Peshwar casket of Kanishka. Annual Report Arch. survey 1908 9, p. 52.

(৫) প্রাচীন মুদ্রা, পৃঃ ১০১।

(৬) Hellenism in Ancient India, p. 100.

হইতে ভারতশিল্পকে স্বকীয় দোষগুণের উপরই নির্ভর করিতে হইয়াছিল (৭)।

শ্রীযুক্ত হেভেল মহাশয় বলিয়াছেন যে, খৃঃ দ্বিতীয় হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে শুধু দেবাদর্শই (Buddhist Divine ideal) কল্পিত, ও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই,—সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উপাস্য দেবতা সম্বন্ধীয় পরিকল্পনাও, বহু-শীর্ষ ও বহুভুজমূর্ত্তি-নিচয়ে মামল্লপুরম্ ও এলিফ্যাণ্টা, এলোরা প্রভৃতি গুহায় পরিব্যক্ত হইয়াছে। ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতাপ্রভাবে ললিতকলা ও সাহিত্য-বিষয়ক সৃষ্টির ইহাই সর্ব্বপ্রধান যুগ। এই যুগেই ভারতীয় শিল্পের আদর্শসমূহ এবং তৎসম্ভূত উচ্চ সভ্যতা ও মানসিক উন্নতি বিকাশলাভ করিয়া সমভাবেই দেশপ্রদেশে বিস্তৃতি লাভ করে। ভারতের বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম-সম্পর্কীয় ভাস্কর্য্য শুধু উত্তরাপথ বলিয়া নহে—সিংহল, যবদ্বীপ, চীন, মহাচীন (কোরিয়া), জাপান প্রভৃতি দেশেও উন্নতির শেষ সীমায় উপনীত হয়। (Zenith of Indian art, Ostassiatische Zeitschrift, Vol I, Pages 4 & 11)। খৃঃ দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে উড়িষ্যার ভাস্কর্য্যের যে চরম উন্নতি ঘটিয়াছিল, এরূপ অনুমান হয় না। উত্তরাপথের ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন আদর্শ ও ভাস্কর্য্য-পদ্ধতি তৎপূর্ব্বে কেন যে উৎকলে বিস্তারলাভ করে নাই, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সম্ভবতঃ রাজনৈতিক বিপ্লবই ইহার অন্যতম কারণ। খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী—সম্ভবতঃ খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর তঙ্ক নামধেয় যে সকল পুরী কুষণমুদ্রা (J. B. O. R. S. March 1919, p. 84) উড়িষ্যায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে গুলি কোন্ রাজবংশের কোন্ কোন্ রাজা-কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি অজ্ঞাত রহিয়াছে। এই যুগের উড়িষ্যার ইতিহাস এখনও তমসাচ্ছন্ন। কেশরী-রাজগণ কিম্বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাজবংশ কি প্রকারে বিধ্বস্ত ও রাজ্যচ্যুত হইয়াছিল, তাহা এখনও রহস্যে সমাবৃত। ভরসা হয়, রাজনৈতিক ইতিহাসের এ সকল তত্ত্ব মীমাংসিত হইলে, শিল্পবিষয়ক ইতিহাসের পন্থাও সুগম হইবে।

সে যাহা হউক, মধ্যযুগের হিন্দু ও বৌদ্ধ-ভাস্কর্য্যে গ্রীক-প্রভাব কিঞ্চিন্মাত্রও লক্ষিত হয় না। যে সকল গ্রীক-শিল্পী ভারতবাসীদিগের নির্দ্দেশমত মূর্ত্তি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেন, তাঁহারা যে ক্রমশঃ ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত

(৭) Hellenism in Ancient India. p. 61. Vide also Havell's the Zenith of Indian Art, p. 10-11 (1912).

হইয়াছিলেন, ইহাই বিশ্বাসযোগ্য অনুমান বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে, ক্রমশঃ ভারতীয় প্রভাব যে গ্রীক-ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 'খাসরাবা' নামে পরিচিত বেশনগরের গরুড়স্তম্ভ 'ভাগবত' (বিষ্ণু উপাসক) হেলিওদোর নামক গ্রীক-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (৮)। ১৯১৪-১৫ সালে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবদত্ত-রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় বেশনগরে ভূগর্ভ হইতে যে সকল মৃণ্ময় মুদ্রা ('শীল') আবিষ্কার করেন, তাহার মধ্যে টিমিত্র বলিয়া (Demitrius) একজন গ্রীকের নাম পাওয়া গিয়াছে। ইনি যে যজমানস্বরূপ কোনও যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা মুদ্রানিহিত 'হোত', পোতা', 'মন্ত্র' প্রভৃতি শব্দ হইতেই বুঝা যায়। ('টিমিত্র-দাত্রিস্য [স] হোত পোতা মংত্র সজন [ই]) (৯)। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর বলিয়াছেন 'গ্রীক-যবনের এই যজ্ঞানুষ্ঠানে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, যেহেতু শক ও পহ্লব প্রভৃতি বিদেশীদিগের ন্যায় অনেক গ্রীকও হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।' এই সকল খণ্ডপ্রমাণ মুষ্টিমেয় গ্রীক ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে ভারতীয় প্রভাবেরই ক্রমবিস্তার প্রমাণিত করিতেছে। বিদেশী-প্রভাব যেখানে যে টুকু পাওয়া যায়, তাহা অস্বীকার করা সত্যানুসন্ধিৎসু লেখকের কর্ত্তব্য নহে। এরূপ ভাবে সত্যের অপলাপ করিবার চেষ্টায় এ প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। যতদূর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ভুবনেশ্বরের শিল্পকলায় বিদেশী প্রভাব আছে কি না এবং থাকিলে কতদূর আছে, তাহাই বিচার্য্য। মধ্যযুগে দেখা যাইতেছে, ভারতীয় শিল্পের উপর গ্রীকপ্রভাব অপেক্ষা গ্রীক-শিল্পিগণের উপর ভারতীয় প্রভাবই অধিকতর পরিস্ফুট। এমন কি সম্রাট্ অশোকের স্থাপত্য নিদর্শনে পর্সিপলিসের অনুকরণে নির্ম্মিত স্তম্ভশ্রেণী ও বিদেশী শিল্পরীতি-অনুযায়ী খোদিত রেলিং বা বেষ্টনীর মধ্যেও শক্তিমান্ খাঁটি ভারতীয় শিল্পপ্রথার অস্তিত্ব সেই প্রাচীনকালের ভাস্কর্য্য হইতেই অনুমিত হইয়াছে(১০)।

(৮) Rapson's Ancient India, p. 157. ডায়নের পুত্র তক্ষশিলাবাসী হেলিওদোর ('হেলিওদোরেণ দিয়সপুত্রেণ তক্ষসিলাকেন') গ্রীকরাজ অণ্ডলিকিতের দূতরূপে রাজা কাশীপুত্র ভাগভদ্রের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন।

Also Arch. Report, 1913-14. Excavations at Beshnagar, 186-187.

(৯) Progress Report, Arch. Survey, W. Cifcle, 1914-15, p. 64. শ্রীযুক্ত ডাঃ গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিজ গ্রন্থে এই প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন।

(১০) Havell's Ideals of Indian Art, p. 17.

ফরাসী লেখক মরিস ম্যান্দ্রঁ (M. Maurice Maindron) তাঁহার ভারতীয় শিল্পকলা-বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, য়ুনানী প্রভাব ভারতে কখনও বিশেষ ভাবে প্রবল হইতে পারে নাই। এ শিল্পের ক্ষণস্থায়ী ক্রিয়ায় ভারতীয় প্রতিভা সামান্যমাত্র রূপান্তরিত বা বিকৃত হয় নাই। ভাবাদির সরল অভিব্যক্তি (naivété) ও ধর্ম্মবিষয়ক কঠোরতার বিকাশই যে ভারতীয় শিল্পের যথোপযুক্ত আদর ও প্রশংসার প্রত্যবায় ঘটাইয়াছে, লেখক এ প্রসঙ্গে এ কথারও উল্লেখ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়পরায়ণতা-দ্যোতক অথবা রূপক ও সাঙ্কেতিক নিদর্শনমূলক মূর্ত্তিনিচয়েও ভারতীয় শিল্পীর যে ক্ষমতার, যে স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায়, অপক্ষপাতী দর্শকেরাও তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না (১১)।

তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি সমঝ্দার অন্য একজন বিদেশী লেখক (১২) ভারতীয় মন্দিরের ভাস্কর্য্য-বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া খোদিত মূর্ত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, ভুবনেশ্বরের শিল্পসম্বন্ধেও তাহা কম প্রযোজ্য নহে। এখানেও প্রস্তরে খোদিত অদ্ভুত, বিকটাকার, বিরাটকায়, কাল্পনিক জীবাদির প্রতিকৃতি যথেষ্ট বিদ্যমান। ভয়াবহ মূর্ত্তিসমূহেরও অভাব নাই। আবার শিল্পী ঈষৎ-হাস্যস্ফুরিতাধরা, বিবিধ চিত্তাকর্ষক 'মুদ্রা'সন্নিবিষ্ট, বিস্তৃতবাহু দেবীমূর্ত্তি-সমূহ নির্ম্মাণ করিয়া যে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা ভাস্কর্য্য-হিসাবে অনিন্দনীয় বলিলে অত্যুক্তি দূরে থাক্, উপযুক্ত প্রশংসারই অভাব ঘটিবে। দেওয়াল ব্যাপিয়া নর্ত্তকী ও অপ্সরারা কত বিমোহন ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান—মনে হয় যেন তাহাদের এ শ্রেণীবদ্ধ-মূর্ত্তির অন্ত নাই। ইহার মধ্যে কঠিন আলিঙ্গনে বদ্ধ মিথুন-মূর্ত্তিও রহিয়াছে, আবার নর্ত্তকীর লাস্যে স্থানে স্থানে অশ্লীল ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী লে বঁ মহাশয় বলিয়াছেন, "ভুবনেশ্বর, সাঞ্চী, এলোরা, অজন্তা, বাদামী, খাজুরাহো, কুম্ভকোণম্ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের গুহাদি ও মন্দিরসমূহে সামান্য অপকৃষ্ট নমুনার পার্শ্বদেশেই যে সকল উচ্চশ্রেণীর অপূর্ব্ব শিল্প-নিদর্শন দেখা যায়, তাহা কোনও পাশ্চাত্য শিল্পীই আপনার বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করিবে না।" শিল্প-কলার (পরীক্ষা) 'যাচাই' ব্যাপারে এখন শিক্ষিত ভারতবাসী শুধু ইউরোপের মুখ

(১১) L' Art Indien par M. Maindron, p. 126.

(১২) Dr, Gustave le Bon, quoted in L' Art Indien. p. 127.

তাকাই নাই, আপনাদের জিনিস আপনারাই পরখ (পরীক্ষা) করিয়া বুঝিয়া লইতে শিখিতেছেন। দেশীয় বিশেষজ্ঞগণের এ সম্বন্ধে মতপ্রকাশের প্রয়োজন হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিবেন যে, প্রাচ্য-শিল্পের ধারা সম্যক্‌ভাবে আয়ত্ত করিয়া ভারতীয় শিল্পীর কস্‌রতের সহিত তাহার নিজস্ব ভাবপ্রবণতাটুকু ধরিয়া লইতে পারিলে, জগতের যে কোনও ভাস্কর যথার্থই আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করিতে পারে। ভারতীয় শিল্পের গতি ও প্রকৃতি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে সম্ভব নহে। ভাস্কর্য্যে foreshortening বা বস্তুসমূহের তির্য্যকভাবে দৃষ্ট প্রতিরূপ তক্ষণের রীতি এবং খোদিত-মূর্ত্তির মাংসপেশীসমূহ প্রদর্শন করার কৌশল যদি ভারতীয় ভাস্কর বিদেশীর নিকটই শিখিয়া থাকে, তাহাতেও বিশেষ লজ্জিত হইবার কারণ দেখি না ;—তবে যত্র তত্র গ্রীক গৌরব সমর্থন-চেষ্টা পণ্ডিতদিগের পক্ষেও নিরাপদ নহে (১৩)।

উড়িষ্যার মন্দিরগাত্রস্থ রমণীমূর্ত্তিসমূহের উদ্দাম যৌবনশ্রী ও সুঠামভঙ্গী দেখিয়া স্বর্গগত হাণ্টার মহোদয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলেই এতৎ সম্পর্কে 'lusciousness of form,' 'delicious pose' প্রভৃতি শব্দ চোখে পড়িয়া যায়। তাঁহার আমলে পণ্ডিত-সমাজের মতবাদে তথাকথিত বিদেশী প্রভাবের হাওয়া বড় জোরেই বহিতেছিল। সুতরাং তিনি যে উধাও (অনিয়ন্ত্রিত) কল্পনার বশীভূত হইয়া মাদলা পঞ্জীতে লিখিত উড়িয়া প্রবাদের যবনদিগকে গ্রীক ধরিয়া লইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ দেখি না। হাণ্টার বলিয়াছেন,

(১৩). আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৩৮০০ বৎসরের ব্যাবিলোনীয় সভ্যতার বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া ব্যাবিলোনিয়া ও আসিরিয়ার ইতিহাস-লেখক অধ্যাপক উইঙ্কলার মহাশয় বলিয়াছেন যে, সার্গন ও নরাম্‌সিনের লিপিসমূহের বর্ণমালা অতি সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত এবং লাগাশের সামন্তরাজ গুডিয়ার আমলের মূর্ত্তিগুলির নির্ম্মাণ-কৌশল এতই সুন্দর যে, পুরাতত্ত্ববিদেরা একসময়ে উহাতে গ্রীক-প্রভাব অনুমান করিয়া লওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন। ('So excellent is the technical execution of Gudea's statues that Archæologists once thought it necessary to assume, a Greek influence')—Dr. H. Winckler's History of Babylonia and Aesyria, p. 49). আচার্য্য উইঙ্কলারের গ্রন্থের ইংরাজ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্রেগ্‌ (Craig) মহাশয়ের মতে সার্গন ও তৎপুত্র নরামসিনের অস্তিত্বকাল যথাক্রমে ৩৮০০ খ্রীঃ পূঃ ও ৩৭৫০ খ্রীঃ পূঃ অব্দ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

"চৌদ্দ শত বৎসর কাল দেশপর্য্যটনের পর যবনেরা উড়িষ্যার সমুদ্রতটে আসিয়া স্থায়ীভাবে বিশ্রামসুখ ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল" (১৪)। কোথা হইতে, কোন্ দিক দিয়া আসিল, কোথায় আসিয়া বসবাস করিল, এতদিন কোথায় ছিল, উপযুক্ত প্রমাণসহ এ সকল প্রশ্নের সদুত্তর না পাইলে এরূপ উক্তি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। পঞ্জাব হইতে পূর্ব্বদিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, গ্রীক আদর্শের লক্ষণগুলি যে ততই দুর্লভ হইয়া উঠে, তাহা হাণ্টারের ন্যায় বিচক্ষণ লেখকের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। উড়িষ্যা-শিল্পি-রচিত নারীদেহের যৌবনের পীবরতার সহিত গ্রীক তন্বঙ্গীদিগের দেহাবয়বের কোন সাদৃশ্যই দৃষ্ট হয় না। পাশ্চাত্য স্ত্রীমূর্ত্তির মুখমণ্ডলের 'লম্বা'ভাব উড়িষ্যায় একবারেই বিরল। মূর্ত্তিগুলির মুখের ডৌলে,অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যে ও উচ্চবিন্যস্ত কেশদামে গ্রীক 'আদ্‌রার' (ক্ষীণ-অনুরূপতারও) সম্মান কোথাও রক্ষিত হয় নাই, ইহা লক্ষ্য করিয়াও সুপণ্ডিত উড়িষ্যার ইতিবৃত্তরচয়িতা উৎকল-দেশীয় একটি বিশিষ্ট শিল্পপ্রথার অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারেন নাই ; পরন্তু বলিয়াছেন যে, গ্রীক শিল্পকলার আদিম বিশুদ্ধতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা হাণ্টার-মহোদয়ের দোষ বলিতেছি না,তাঁহার সমসাময়িক শিক্ষাপ্রভাবের অবশ্যম্ভাবী ফল মাত্র। যে নকল য়ূনানী শিল্প (pseudo-classical art) কুষণযুগে ভারতের নিজস্ব শিল্পধারার প্রতিবন্ধকতা করিতে গিয়া আপনার বিশেষত্ব বিসর্জ্জন দিয়াছিল, মথুরার ন্যায় স্থানে নূতন পারিপার্শিক অবস্থায় পড়িয়া যাহা নিজ জীবনীশক্তি হারাইয়া ভারতশিল্পকেও জীবন্মৃত করিয়া তুলিয়াছিল (১৫), বহু শতাব্দী পরে উড়িষ্যার ভাস্কর্য্যকলা পুনরুজ্জীবিত করার তাহাই যে মূলীভূত কারণ, এ কথা কোন্ হেতুবাদে স্বীকার করা যাইতে পারে ? য়ূনানীপ্রভাব-সম্পৃক্ত মথুরা-শিল্পে সাঞ্চী ও বরাহতের (ভারহুতের) খাঁটী মূল ভারতীয় শিল্পধারা যে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিল, সম্ভবতঃ তাহারই ফলে দক্ষিণ পূর্ব্বাঞ্চলের ভাস্কর্য্যের তুলনায় মথুরার মূর্ত্তিনিচয় একবারে বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয় না। গ্রীক শিল্প মাংসপেশীসমূহ বিশেষ ভাবে প্রদর্শিত হইয়া থাকে ; কিন্তু উড়িষ্যা-শিল্পের নিদর্শনগুলিতে কোথাও তাহা দৃষ্ট হয় না। উড়িষ্যা-ভাস্কর্য্যে পুরুষমূর্ত্তি অপেক্ষা স্ত্রীমূর্ত্তিগুলিই অধিক সুন্দর, পুরুষমূর্ত্তিগুলির অনেক স্থলেই মুখের থল্‌থলে (শিথিল) ভাব, গুম্ফ ও শ্মশ্রু

(১৪) Sir W. to Hunter's Orissa, Vol I, p. 231.

(১৫) Marshall's Guide to Sanchi, p. 16. Foot note.

প্রভৃতির বিন্যাস একেবারে অস্বাভাবিক না হইলেও, অশোভনই বলিতে হয়, যেন কোন প্রকারে লাগাইয়া বা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বিগ্রহমূর্ত্তিগুলির বেলা অবশ্য এ আপত্তি অনেক ক্ষেত্রে খাটে না। লিঙ্গরাজের মন্দিরগাত্রস্থ কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তি ভারতীয় পুংসৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া মনে হয়। ভুবনেশ্বরের গণেশ-মূর্ত্তিটিও এ জাতীয় বিগ্রহের মধ্যে সৌন্দর্য্য-হিসাবে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। ফরাসীদেশের 'মুসে গিমে' (Musèe Guimet) চিত্রশালায় রক্ষিত গ্রাণাইট-প্রস্তরনির্ম্মিত কার্ত্তিক-মূর্ত্তি ও রজতনির্ম্মিত গণেশ-মূর্ত্তির চিত্রদ্বয়ের সহিত (L' Art Indian, fig. 39, p. 131 and fig. 50, p. 142) পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিদুইটির প্রতিকৃতির সাদৃশ্য বিচার করিলে সহজেই এ কথা প্রতি-পন্ন হইবে। 'গিমে' চিত্রশালার কাষ্ঠ-খোদিত পার্ব্বতীমূর্ত্তির সহিত ভুবনে-শ্বরের বড় দেউলের ভগবতীমূর্ত্তির তুলনা করিলে শেষোক্ত মূর্ত্তিটি যে কত শ্রেষ্ঠ, তাহা সামান্য শিশুকেও বুঝাইয়া দিবার আবশ্যকতা হয় না। বস্তুতঃ দেবক্ষেত্র ভুবনেশ্বরের এই সকল মূর্ত্তি এবং কোণার্কের পরমসুন্দর সূর্য্য ও বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রভৃতি অদ্যাপি ভারতশিল্পের গৌরব সসম্মানে রক্ষা করিতেছে।

বিদেশী প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে দুই একটি মূর্ত্তি বাছিয়া লইলে চলিবে না ; সাধারণ মূর্ত্তিগুলির কথাই বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

শিল্পিগণ যে পুরুষমূর্ত্তি ছাড়িয়া স্ত্রীমূর্ত্তির ব্যাপারেই গ্রীক আদর্শের নিকট সৌন্দর্য্যভিক্ষা করিতে গিয়াছিল, এ অনুমান যদি ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে উড়িষ্যায় গ্রীক প্রভাব সম্বন্ধে অনুকূল মত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে চারিদিক একবার ভালরূপে বিবেচনা করিয়া দেখাই কর্ত্তব্য। ডাঃ গুস্তাভ লে বঁ বলিয়াছেন "গ্রীক সভ্যতার সহিত দীর্ঘকাল সংস্পর্শে আসিয়াও ভারতবর্ষ শিল্পবিষয়ে কোন ঋণই গ্রহণ করে নাই। যেখানে দুইজাতির এরূপ ধাতুগত বৈসাদৃশ্য, সেখানে অনুকরণ বা ঋণগ্রহণ কোনমতেই সম্ভবে না। যাহাদের চিন্তাস্রোত ভিন্নপথে প্রবাহিত এবং শিল্পপ্রতিভাও সুসমঞ্জস হইবার নহে, তাহারা কি করিয়া পরস্পরকে প্রণোদিত করিতে সমর্থ হইবে? হিন্দু-প্রতিভার এমনই বিশেষত্ব যে, বাধ্য হইয়া হিন্দুগণ যখন যাহা কিছু অনুকরণ করিয়াছে, অমনই তাহা সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুভাবে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। * * ভারতে গ্রীক শিল্পের নিজ প্রভাব বিস্তার সম্বন্ধে এই যে নিষ্ক্রিয়তা, তাহা ভারতবাসীদিগের বৈদেশিক শিল্পপদ্ধতি গ্রহণে অক্ষমতার পরিচায়ক নহে ;

বস্তুতঃ উভয় জাতির প্রকৃতিগত বৈষম্যই উহার মূলীভূত কারণ" (১৬)। বহুদর্শী সমালোচকের এই উক্তির পর আমাদিগের আর এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। ডাক্তার লে বঁ উড়িষ্যার স্থাপত্য ও শিল্পকলা-সম্বন্ধেও যথাযোগ্য আলোচনা করিতে ছাড়েন নাই ; সুতরাং তাঁহার মন্তব্য ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা উড়িষ্যার প্রতি কোন অংশেই কম প্রযোজ্য নহে।

ভারত-শিল্পের বৈশিষ্ট—তাহার ভাবপ্রবণতা। যে অধ্যাত্মবাদ স্বর্ণসূত্রের ন্যায় ভারতীয় ধীশক্তি ও দর্শনবিষয়ক গবেষণার সহিত বিজড়িত, তাহা এই ভাবপ্রবণতারই নামান্তরমাত্র। বঙ্গের শাসনকর্ত্তা মহামান্য লর্ড রোণাল্ডশে-মহোদয় যথার্থই বলিয়াছেন যে, ভারত-শিল্পের এই প্রধান ও বিশিষ্ট উপাদান অরণ্যবাসী, তপস্যাপরায়ণ আদিম আর্য্যঋষিগণের নিকট হইতেই প্রাপ্ত। বাদক যেরূপ সাধনার ফলে বাদ্যযন্ত্র হইতে সুমিষ্ট সুর উৎপাদন করে, বিশ্বপ্রকৃতি হইতে ইহাও সেইরূপেই নিঃসৃত (১৭)।

কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে, হিন্দুরা বহির্জগতের অস্তিত্বেই বিশ্বাস করিত না, সুতরাং ভাস্কর্য্য-উৎকর্ষে দক্ষতালাভ বিষয়ে তাঁহাদের প্রেরণা না থাকিবারই কথা। ভারতের ভাস্কর্য্য 'বাস্তু'শিল্পেরই আনুষঙ্গিক। সুন্দর সুকল্পিত পুরুষ ও স্ত্রীমূর্ত্তি, জীবজন্তু বা লতাপাতার চিত্র, নানাবিধ গার্হস্থ্য চিত্র, আপাতদৃষ্টিতে ধর্ম্ম-সম্পর্ক-বিবর্জ্জিত এ সকল শিল্প-নমুনাও উড়িষ্যার দেব-মন্দির ছাড়া অপর কোথাও এরূপ পরিপাটী ভাবে সজ্জিত দেখা যায় না। যে ভারতবাসীদিগের ধর্ম্ম ও ভগবদ্ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ সহস্র সহস্র মন্দিরচূড়া আজিও উন্নতশিরে দণ্ডায়মান, আজিও বহুসংখ্যক দেউল ও স্তূপের ভগ্নাবশেষ যাহাদের কারুকার্য্য ও অপূর্ব্ব শিল্পকুশলতার সাক্ষ্য দিতেছে, ভাস্কর্য্যবিষয়ে

(১৬) Les Monuments de L' Inde par Dr. Gustave le-Bon, pp. 12-15.

(১৭) "How closely the threads of this idealism are woven into the texture of her (India's) intellectual being becomes apparent when we see its origin. For it was first drawn surely from their long and intimate communing with nature by the forest-dwelling ancestors of the race, much as some sweet-toned melody is drawn by a musician from some perfect instrument which he has learned to master."

(H. E. Lord Ronaldshay's address at the Salon of Oriental Art, Govt House Calcutta, reported in the Bengalee, December 6, 1919)

তাহাদের প্রেরণা ছিল না, ইহা কি করিয়া স্বীকার করিব? মায়াবাদী শঙ্করের শিষ্য-সম্প্রদায় ভারতের নানা স্থানে মঠপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, জগৎ অবাস্তব বলিয়া এই 'বাস্তব' শিল্পের উপেক্ষা করেন নাই। মন্দির গড়িলেই তাহার ভিতর ও বাহিরের শোভা সম্পাদন আবশ্যক এবং সাম্প্রদায়িক ভিন্নতা-অনুযায়ী নানাবিধ বিগ্রহও প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। আবার মন্দির-গাত্রে শিল্পী কোথায় দ্বারপাল, কোথায় বৃক্ষবল্লরী, কোথায় মিথুনাদি সন্নিবেশিত করিবে, তাহাও শিল্প-শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং মন্দির-সংক্রান্ত 'বাস্তু'-শিল্প ও ভাস্কর্য্যের মধ্যে একের যদি উন্নতি হয়, সঙ্গে সঙ্গে অপরটিরও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

পাথর কাটিয়া বাস্তু রচনা করিতে ভারতীয়গণ পূর্ব্ব হইতেই অভ্যস্ত ছিল কি না, সে আলোচনা স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল বহুপূর্ব্বেই করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সে সকল কথার পুনরাবৃত্তির আর প্রয়োজন নাই। গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য যাহারা পাথর কাটিতে শিখিয়াছে, পাথর কাটিয়া মূর্ত্তি রচনা করিতেই বা তাহাদের অক্ষমতার সম্ভাবনা কোথায়? থাকুক সে কথা।

উৎকল-সৌন্দর্য্যের আদর্শ পাশ্চাত্য আদর্শ হইতে যতই বিভিন্ন হউক 'সীতার বিবাহ'-চিত্রে সীতাদেবীর মধুর লজ্জাবনতভাব এবং কোণার্কে প্রাপ্ত 'শিক্ষাদান'-চিত্রে (১৮) শিষ্যদিগের নিবিষ্ট-চিত্তে-শ্রবণভঙ্গীতে যে স্বাভাবিক ভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা কোন অংশেই প্রাণহীন বলা চলে না। ভারতীয় শিল্পী 'তালমান' বজায় রাখিয়া চলিত, তাই আকৃতিতে ছোটই হউক আর বড়ই হউক, মূর্ত্তি-গুলির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কোথাও তেমন 'বেমানান' বা অসমঞ্জস বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় নিজগ্রন্থে বিভিন্ন পরিমাপাদি উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভুবনেশ্বরের মন্দিরের মূর্ত্তিগুলি শুক্রনীতি-বর্ণিত 'সপ্ততাল'-শ্রেণীর। সপ্ততাল মূর্ত্তির সমগ্র দৈর্ঘ্য, চিবুক হইতে শিরোদেশের পরিমাপের সপ্তগুণ (৯)। এই সকল মূর্ত্তি অথবা খোদিত চিত্র সাধারণতঃ বিভিন্ন বিভিন্ন খণ্ডে মন্দিরগাত্রস্থ খাঁজ বা কোলঙ্গায় বিন্যস্ত। দক্ষিণী মন্দিরের চিত্রাদির ন্যায় এ গুলিতে বিষয়-পারম্পর্য্য ধারাবাহিক ভাবে রক্ষিত হয় নাই। দেব-দেবীর চিত্রের পার্শ্বেই গার্হস্থ্য চিত্রাদিও দেখা যায়। দক্ষিণী শিল্পী রামেশ্বরের বিরাট দরদালানের ছাদে, সমস্ত রামায়ণ-মহাভারতটা ছবির আকারে

(১৮) Bishan Swarup's Konarka, p. 37.

(১৯) M. Ganguly's Orissa and Her Remains, pp. 209, 214, 222.

ফুটাইয়াছে। কন্যাকুমারিকার নিকটবর্ত্তী 'শুচিন্দ্রম্-মন্দিরের' গোপুরমে (২০) রামায়ণ, মহাভারত এবং প্রায় সমস্ত পুরাণের প্রসিদ্ধ গল্পগুলি খোদিত করিয়াছে—যেহেতু দক্ষিণী শিল্পের ইহাই একটি চির-প্রচলিত প্রথা। কাম্বোজের ওঙ্কার-ভটে এবং যবদ্বীপের বরভুধরে (বরবদুরে) দক্ষিণী শিল্পকুশলিগণ তাঁহা-দিগের স্বপ্রতিষ্ঠিত শিল্পরীতির অক্ষয় চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও দেখিতে পাই—পৌরাণিক বা জাতক কাহিনীর চিত্রগুলি একটির পর একটি ধারাবাহিক ভাবে বিন্যস্ত; সুতরাং একটি পংক্তির কোন একটি চিত্র চিনিয়া লইতে পারিলে, সমগ্র গল্পটিই সহজে বুঝা যায়। উড়িষ্যার মন্দির-চিত্রাদিতে কিন্তু এরূপ ধারাবদ্ধ বিষয়-সন্নিবেশ দৃষ্ট হয় না। সীতার বিবাহের খোদিত চিত্র দেখিয়া নিকটে কোথাও মায়ামৃগবধের চিত্র দেখিবার ভরসা করিলে নিরাশ হইতে হয়। মন্দির-গাত্রস্থ বিভিন্ন কুলুঙ্গীতে যে সকল বিচিত্র মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, পারম্পর্য্য-শূন্য হইলেও সেগুলি বড় কম কৌতূহলজনক নহে।

কোণার্ক-মন্দির দর্শন-কালে তরুসন্নিহিতা রমণীর কয়েকটি চিত্র দেখিয়া-ছিলাম; কিন্তু তখন সেগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করি নাই। এই চিত্র-পরিকল্পনা যে বিতণ্ডার বিষয়ীভূত হইতে পারে, তাহা তখন অবগত ছিলাম না। ভুবনে-শ্বরে প্রাপ্ত এই শ্রেণীর একটি তরুণীর মূর্ত্তি ডাঃ গুস্তাভ লে-বঁ'র গ্রন্থে ৫৬ সংখ্যক চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। ডাঃ লে-বঁ ভুবনেশ্বরের 'বড় দেউল' (লিঙ্গরাজ-মন্দির) খ্রীঃ ৭ম শতাব্দে নির্ম্মিত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তিনি এ মূর্ত্তিটি ৭ম শতাব্দে নির্ম্মিত বলিয়া প্রকাশ করিলেও ইহা যে কোন্ মন্দিরে সংলগ্ন ছিল, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। এই স্ত্রীমূর্ত্তির ভঙ্গী বড়ই সুন্দর। রমণীর বাম হস্তে পুষ্পসমন্বিত বৃক্ষশাখা, বাম পদটি উত্তোলিত,—যেন বৃক্ষকাণ্ডে সংস্পৃষ্ট। শ্রীযুক্ত হেভেল প্রণীত Ideal of Indian Art গ্রন্থে (pp. 101-102) বিলাতে ভিক্টোরিয়া-আলবার্ট চিত্রশালায় রক্ষিত এইরূপ একটি মূর্ত্তির চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। বুদ্ধের জন্মগ্রহণকালে বুদ্ধজননী মায়াদেবীর মূর্ত্তি যেরূপ প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহাতে দেখিতে পাই যে, রাজ্ঞী মায়া একটি বৃক্ষের কাণ্ডে হেলান দিয়া, একটি পদ উত্তোলন করিয়া বক্রভাবে দাঁড়াইয়া আছেন; আর শিশু শাক্যসিংহ মাতার কুক্ষিদেশ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইতেছেন। বুদ্ধ লুম্বিনী বনে শাল্মলী বৃক্ষতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই পিত্তল-নির্ম্মিত নেপালী

(২০) উপাসনা, কার্ত্তিক—১৩২৬, পৃঃ ৪৫০।

মূর্ত্তিসমূহে বৃক্ষটি বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই প্রদর্শিত হইয়া থাকে। বিদীর্ণ কুক্ষিদেশ ও তাহা হইতে অর্দ্ধনির্গত শিশু দেখিলেই মায়াদেবীর মূর্ত্তি চিনিয়া লওয়া যায়। ভারহুতের স্তূপে 'চন্দা' নামক একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত যক্ষিণী মূর্ত্তি আছে, তাহাও বৃক্ষকাণ্ডের সহিত সংসক্ত (Cunningham's Bharhut, Plate XXII)। আবার সাঞ্চীর পূর্ব্বতোরণে দেখা যায়—একটি যুবতী-মূর্ত্তি দুইহাতে একটি অশোক-শাখা ধরিয়া আছে এবং বামপদে বৃক্ষকাণ্ডের অধোদেশ স্পর্শ করিতেছে। রমণীর পদপল্লব বহু অলঙ্কারে সমাবৃত। শ্রীযুক্ত ভিন্সেণ্ট স্মিথ-প্রমুখ গ্রীকপ্রভাববাদী পণ্ডিত মিসরদেশে এইরূপ বৃক্ষে-ঠেস্-দেওয়া পুরুষমূর্ত্তি দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে, গ্রীকগণই মিশরে উহা প্রচারিত করে এবং গ্রীক শিল্পীদিগের দ্বারাই এই মনোহর বাঁধাছাঁচের (motif) মূর্ত্তিগুলি ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল। এই মূর্ত্তিপরিকল্পনার যে কি উদ্দেশ্য, শ্রীযুক্ত স্মিথ মহোদয় তাহা আলোচনা করেন নাই। খ্রীঃ ১৯০৯ সালের সুদূর প্রাচ্যবিদ্যা-অনুশীলন-সমিতির মুখপত্রে আচার্য্য ফোগেল (Dr. J. Ph. Vogel) "সুন্দরী-তরুণী ও অশোক বৃক্ষ" (La Bille et L' Arbre Acoka) নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন, তাহাতে এ চিত্রের গূঢ়ার্থ অতি সুন্দরভাবে নির্ণীত হইয়াছে (২১)।

মথুরার কালেক্টার-সাহেবের কুঠিতে প্রস্তরনির্ম্মিত পিল্‌পাদার আলিসার (balustrade) একটি খণ্ডীকৃত অংশ কিছু দিন ধরিয়া পড়িয়াছিল। পরে উহা স্থানীয় সংগ্রহশালায় স্থানান্তরিত হয় (Ex. J 55 Mathura Museum catalogue, p. 153) এই প্রস্তরখণ্ডের একদিকে কতকগুলি পদ্মাকৃতি পুষ্পের প্রতিরূপ ও অপরদিকে একটি অল্পবয়স্কা তরুণী অশোক-তরুর কাণ্ডদেশে হেলিয়া, বামহাতে একটি পুষ্পসমন্বিত শাখা ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মথুরার শিল্পিগণ যে সকল নৃত্যনিরতা বিলাসিনী-দিগের মূর্ত্তি বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরাদির চতুঃপার্শ্বে সংস্থাপন করিতে ভাল-বাসিত, এটি সে প্রকার নহে। রমণীর বামপদ পুষ্পিত তরুর কাণ্ডদেশ স্পর্শ করিয়া আছে। দীর্ঘ অপ্রশস্ত পত্রগুলি দেখিয়া বৃক্ষটি যে অশোক, যে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। আচার্য্য ফোগেল বলিয়াছেন, অগ্নিমিত্র

(২১) Bulletin de L' Ecole Francaise de Extriene Orient. Tome IX, 1909, p. 531.

মালবিকাকে যে কি অবস্থায় দেখিয়া প্রণয়মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা ইহা হইতেই অনুমান করা যায়। সুন্দরী নারীর পদাঘাতে যে অশোক-ফুল ফুটিয়া উঠে, ভারতীয় কবিদিগের এ বিশ্বাস সুপরিচিত। ইংরাজ-কবি টেনিসন তাঁহার একটি কবিতায় নায়িকার পদক্ষেপণে 'ক্রোকাস' (crocus) পুষ্প প্রস্ফুটিত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন বটে; কিন্তু অশোকজাতীয় তরুবিশেষে এই উপায়ে পুষ্পোৎপাদন সম্বন্ধে ধারণা কেবল এতদ্দেশীয় কবিতায় একটি চিরপ্রচলিত প্রথা (Convention) রূপে গণ্য হইয়াছিল। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে মালবিকা যখন রাজ্ঞীর আদেশে অশোকবৃক্ষে বামপদ স্পর্শ করাইয়া অশোক-বৃক্ষের দোহদ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতেছিলেন, সেই সময়ে সঙ্গী-বিদূষকসহ অন্তরালে-প্রচ্ছন্ন রাজা অগ্নি-মিত্রের তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিবার সুযোগ ঘটে। মেঘদূতের * যক্ষও অশোক-তরুর ন্যায় প্রিয়ার বামপদ-স্পর্শলাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

ডাঃ লে বঁর গ্রন্থের চিত্রের সহিত মথুরার এ মূর্ত্তিটির প্রতিকৃতি মিলাইলে দেখা যায় যে, এই দুইটিতে বিশেষ কোনও প্রভেদ নাই (২২)। কুম্ভ-কোণমের সমীপবর্ত্তী ত্রিভুবনম্ নামক দক্ষিণী মন্দিরে দ্বারপালিকার প্রস্তর-খোদিত মূর্ত্তিতেও এইরূপ বৃক্ষকাণ্ডে পাদস্পর্শ করার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, দেখিতে পাই। ইউরোপে আচেন নগরের বিখ্যাত ধর্ম্মমন্দিরে রক্ষিত হস্তীদন্তপটে খোদিত একটি আলেখ্যেও এইরূপ তরু ও তরুণীর সমাবেশ দেখা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত ষ্ট্রজিগউস্কি মহাশয় বলিয়াছেন যে, ভারতীয় ভাস্কর্য্যশিল্পের পূর্ব্বোক্ত নমুনা ও মিশর দেশের সেকেন্দ্রিয়ার কপ্টিক শিল্পের বাঁধাছাঁচের এই অনুকৃতি একই আদিস্থান হইতে উদ্ভূত। সম্ভবতঃ ইহার প্রথম আবির্ভাব সিরিয়া বা এসিয়া-মাইনর-প্রদেশে হইয়া থাকিবে (২৩)।

* একঃ সখ্যা স্তবসহ ময়া বামপাদাভিলাষী।
কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদনমদিরাম্ দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ॥
(উত্তরমেঘ, শ্লোক ১৭)

(২২) শ্রীযুক্ত হেভেল প্রণীত Ideals of Indian Art গ্রন্থে (পৃঃ ১০১-১০২) বিলাতের 'ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট' চিত্রশালায় রক্ষিত এইরূপ একটি নমুনার প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে।

(২৩) J. Strzygowski, quoted in Dr. G. N. Banerjee's Hellenism in Ancient India, p. 74.

সিংহলের "নারীলতা" (২৪) ও মকর-মুখ হইতে বিনির্গত বল্লরী-সমূহে সমাবেষ্টিতা আধুনিক দক্ষিণী নারীমূর্ত্তি (২৫), এই সুপরিচিত নক্সার সহিতই জ্ঞাতিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে (২৬)। ভারতীয় ললিতকলাতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আনন্দকুমারস্বামী-মহাশয় ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী ইউরোপীয় সভ্যতা এবং ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কারাদির একতা প্রসঙ্গে বঙ্গদেশীয় মনসা-মূর্ত্তির সহিত প্রাচীন গ্রীসীয় সর্পদেবীর মূর্ত্তির এবং ভূদেবীর এবং পৃথ্বীস্থানীয়া গ্রীক "গেয়া' (Gaea) দেবীর সাদৃশ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন (২৭) যে, এসকল পুরাতন ছাঁচের মিল খুঁজিতে হইলে, সভ্যতার আদিযুগে অন্ততঃ ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে যাইয়া পহুছিতে হয়। খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসরে যে কালে এই প্রকার আদর্শ, চীন-দেশে প্রচারিত হওয়ার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়, সেই সময়েই উহা ভারতে আসা সম্ভব বলিয়া মনে হয়। এই সকল পরিকল্পনা উত্তরের পথে বাক্‌ট্রিয়া হইয়া, ককেসসপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, কি পারস্যের পথে, পারস্য-উপসাগর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সম্ভবতঃ তখন ককেসসের পথদিয়া নির্ব্বিরোধে গমনাগমন করা চলিত। তাহা না হইলে চিত্র ও নক্সার একটি সুনির্দ্দিষ্ট স্তর-জ্ঞাপক এতগুলি বাঁধা আদর্শ ভারতে আসিয়া পহুছিতে পারিত না। কতকগুলি আদিম আদর্শ ইজিয়ান-সাগরের উপকূল হইতেই আসুক, সিরিয়া হইতেই আসুক, এরূপ সাদৃশ্যে কোনও দেশের শিল্পধারার বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হইবার নহে। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণগুলি অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে, ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত এই তরু ও তরুণীর পরিকল্পনাটি ভারতীয় বলিয়া

(২৪) Nari-lata, fig 27, Dr. Coomaraswa—my's Mediæval Sinhalese Art. p. 92.

(২৫) Girl with the creeper falling over her, Havell's Ideals of Indian Art, pl. XIII.

(২৬) সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যে একটি ধাতুনির্ম্মিত বিটপ-সন্নিহিতা দেবীমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার পাদপীঠে ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয় যে, ইহা কোথাও বিগ্রহ icon রূপে পূজিত হইত। এ দেবী মায়াই হউন, বা অপর কিছুই হউন, আসলে যে ইনি ভারতীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(২৭) Ostasiatische Zeitschrift, Vol III, p. 387.

ধরিয়া লওয়াই সমীচীন বোধ হইবে। কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত, ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত, কয়েকটি স্ত্রীমূর্ত্তির মধ্যে দর্পণধারিণী একটি মূর্ত্তি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মথুরার পাথরের পিল্লায় খোদিত স্ত্রীমূর্ত্তিগুলির মধ্যে দর্পণ-ধারিণী একটি নারীমূর্ত্তির চিত্র জেনেরাল ক্যনিংহাম কর্ত্তৃক ১৮৭১-৭২ সালের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে [ছয় (VI) সংখ্যক চিত্র দ্রষ্টব্য] (২৮)। কিন্তু ইহার সহিত উড়িষ্যার মূর্ত্তিটির সেরূপ আকৃতিগত সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয় না। নিজসৌন্দর্য্যমুগ্ধ এই রমণীমূর্ত্তির পরিকল্পনায় যে রসবত্তার ভাব (Sense of humour) দৃষ্ট হয়, অন্যটিতে তাহা একেবারেই বিরল। উড়িষ্যায় মন্দির-গাত্রে মনবিমোহন ভঙ্গীতে যে সকল একক রমণীমূর্ত্তি দণ্ডায়মানা দেখা যায়, তাহার কোন কোনটির অনুরূপ স্ত্রীমূর্ত্তি মথুরা-ভাস্কর্য্যেও লক্ষিত হইয়া থাকে (২৯)। বলা বাহুল্য, এ সাদৃশ্য সেরূপ সুপরিস্ফুট নহে। কানিংহামের চিত্রনিহিত মূর্ত্তিগুলির মধ্যে একটিতে অশ্লীলতার একটু ইঙ্গিত আছে বটে (fig. C. Pl. VI), কিন্তু কোণারকে এইরূপ যে একটি মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, তাহা একেবারেই বীভৎস-তার প্রতিরূপ। দেশ, কাল ও পাত্রভেদে যে ললিত কলার রাজ্যেও ভাববিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, তাহা অস্বীকার করিবার নহে। ভারতীয় কলা-পদ্ধতি ঠিক একই ভাবে বাহিত হয় নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যে, নারীদেহে, নিতম্ব ও বক্ষোদেশের পৃথুতা, ভারতীয় শিল্পের বিশেষত্ব বলিয়াই পরিগণিত। মথুরায় প্রাপ্ত মূর্ত্তিনিচয়ে দেখা যায়, নিতম্বদেশ অনেক স্থলে কটির পরিমাপের আড়াই (২৷৷০) গুণের কম নহে (৩০)। উড়িষ্যার মূর্ত্তি-গুলির আমরা মাপ গ্রহণ করিতে পারি নাই; যতদূর স্মরণ হয়, তাহাতে রমণী-মূর্ত্তিসমূহের দেহাংশ-বিশেষের এরূপ অনাবশ্যক নিবিড়তা কোথাও বিসদৃশ ভাবে চক্ষে পড়ে না।

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়-মহাশয় মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় সিংহ ও হস্তীর উপাখ্যান-বিষয়ক যে সুন্দর তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে যে, 'উড়িষ্যার ১১শ ও ১২শ শতাব্দীর ব্রাহ্মণ্য মন্দিরের অনেক প্রসাধক নারীমূর্ত্তির আদর্শ

(২৮) A. S. R. 1871-72, Vol III, Pl. VI.

(২৯) Ibid, Pl. VI, VII & XI.

(৩০) A. S. R. Vol III, P. 31

২য় ও ৩য় শতাব্দীর জৈন ও বৌদ্ধপ্রাকারের নক্সা হইতে গৃহীত—তাহারা যে সমজাতীয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই' (৩১)। বিশেষজ্ঞের এ মত বিশেষ অনুধাবন-যোগ্য সন্দেহ নাই; কিন্তু ভুবনেশ্বর ও মথুরার ভাস্কর্য্যে যে বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান, এ স্থলে তাহা উল্লেখ না করিলে প্রকৃত স্বরূপতা-টুকুও ভালরূপ বুঝা যাইবে না। মথুরার স্ত্রীমূর্ত্তিগুলি প্রায়শঃ গণমূর্ত্তির উপর দণ্ডায়মানা; তাই কেহ কেহ সেগুলিকে 'Energy acting on matter' অর্থাৎ জড়বস্তুর উপর শক্তির ক্রিয়াশীলতার নিদর্শনরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন (৩২)। কেহ কেহ আবার এই শ্রেণীর মূর্ত্তিগুলিকে 'মার' বা বৌদ্ধ শয়তানের সঙ্গিনীগণের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বিবেচনা করেন। উড়িষ্যার নর্ত্তকীর মূর্ত্তিগুলিকে কোনও গণমূর্ত্তি বা জীবমূর্ত্তির উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখি নাই; বরং ভারহুত বিষয়ক গ্রন্থে কানিংহাম যে কয়খানি চিত্র দিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই, "বটনমার" স্তম্ভগাত্রস্থ নর্ত্তকীমূর্ত্তি, উপবিষ্ট গণমূর্ত্তির বিস্তৃত করতলদ্বয়ের উপর নৃত্যের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছে (Pl. XXI)। উক্ত গ্রন্থস্থ ২৩শ সংখ্যক চিত্রে দেখিতে পাই (Plate XXIII), যক্ষিণী সুদর্শনা নৃত্যপরা রমণীর ন্যায় একটি গণ-দেহের উপর দণ্ডায়মানা। আবার স্ত্রী-দেবতা চুলকোক হস্তীর উপর ললিত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। এই সকল চিত্রের সহিত মথুরার পিল্লা-গাত্রস্থ চিত্রগুলির যে অধিক সম্পর্ক, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ডাঃ ফোগেল এ মূর্ত্তিগুলিকে যক্ষী বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে তৎসমর্থিত এ মূর্ত্তি-পরিচয়ের সহিত নর্ত্তকীদিগের মধ্যে কয়েকটির অশ্লীল ভঙ্গীর বিশেষ অসামঞ্জস্য দেখা যায় না। যে স্থাপত্যকীর্ত্তির চতুর্দ্দিকে এ গুলি সন্নিবিষ্ট হইত, লোকের বিশ্বাস ছিল, তাহা ইহাদিগের দ্বারাই সুরক্ষিত হইবে। ভয় দেখাইয়াই হউক বা কামজনিত মোহ উৎপাদন করিয়াই হউক, যে কোন প্রকারে বিরুদ্ধবাদী অনিষ্টকারীকে স্তম্ভিত করিতে পারিলেই যক্ষিণীদিগের কার্য্য-সিদ্ধি হইবে; ইহাই বোধ হয়, তাৎকালিক জনগণের সাধারণ বিশ্বাস রূপে প্রচলিত ছিল। ডাঃ ফোগেল উল্লেখ করিয়াছেন, এই প্রকার কোন কোনও রমণী মূর্ত্তি অস্ত্রধারণ করিয়া আছে, এরূপও দেখা যায়। তাঁহার

(৩১) 'সিংহ ও হস্তীর উপাখ্যান' শীর্ষক মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ। প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩২৬, পৃঃ ৪২।

(৩২) Dr. Waddell's Upagupta in J. A. S. B. Vol. LXVI, p.79, foot note.

মতে হিন্দুমন্দিরে দ্বারপাল ও যবদ্বীপের মন্দিরে রাক্ষসমূর্ত্তিগুলি যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইত, এ গুলিও ঠিক সেই উদ্দেশ্যে স্তম্ভ বা পিল্লাগাত্রে স্থান অধিকার করিয়া আছে (৩৩)। উড়িষ্যায় এক শ্রেণীর বিবৃতযৌবনা প্রগল্‌ভা স্ত্রী-মূর্ত্তিকে স্থানীয় শিল্পিগণ 'অলস নায়িকা' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। দাঁড়াই-বার ভঙ্গী সম্পূর্ণ না মিলিলেও পাদাদি-বিন্যাসে মথুরার দুই একটি নর্ত্তকীমূর্ত্তির সহিত ইহার কতক সাদৃশ্য দেখা যায়। ভারহুত স্তূপপ্রতিষ্ঠার কাল হইতে যে কলা-পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া মথুরায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, বহুশতাব্দী পরে ভুবনেশ্বর বা কোণার্কের মন্দিরগাত্রে কালবশে পরিবর্ত্তিত সেই সকল যক্ষী-মূর্ত্তি—'অলস নায়িকা' প্রভৃতি আকারে যে পূর্ব্বকালের ন্যায় একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় নাই,—এ কথা সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার করা সহজ নহে। ভারত-শিল্পের প্রাচীন আদর্শগুলি অনেক পরিমাণে অদ্যাবধি রক্ষিত হইয়াছে। উড়িষ্যা-মন্দিরের বহির্দ্দেশে খোদিত নাগমূর্ত্তির ন্যায় মথুরা-ভাস্কর্য্যেও পঞ্চ ও সপ্তফণাযুক্ত নাগমূর্ত্তি দেখা যায়; তবে উড়িষ্যা ভাস্কর আবর্ত্তিত-পুচ্ছ-নাগদেহ-তক্ষণে প্রসাধক কলার দিক দিয়াও যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে তাহার নিজস্ব মৌলিকত্বটুকু যে কম বিকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে। ভুবনেশ্বরের ভাস্কর্য্য-সমালোচনায় আমরা সাধারণতঃ উত্তরাপথের শিল্পধারাগত সাদৃশ্যেরই অনুসন্ধান করিয়া থাকি; কিন্তু তুলনাগত বিচারের উদ্দেশ্যে এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ ও পশ্চিমভারতীয় শিল্পকলার এখনও ভালরূপ অনুশীলন হয় নাই। ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত যে যোদ্ধা ও তাহার প্রণয়িনীর খোদিত চিত্র রাজা রাজেন্দ্রলালের উড়িষ্যার পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে, ঠিক তাহারই অনুরূপ একটি চিত্র কার্লির সুবৃহৎ চৈত্যে দৃষ্ট হয় (Maindron, Fig.36, p. 128)। কেবল পার্থক্যের মধ্যে এই যে, কার্লির যুগলমূর্ত্তির অবয়ব যেন কতকটা অধিক সুপুষ্ট এবং পুরুষমূর্ত্তিটির মস্তকাবরণ বিভিন্ন রকমের। কোনও কোনও পণ্ডিত কার্লির খোদিত চিত্রাবলীতে পার্সি-পলিসের প্রভাব সন্দেহ করিয়া থাকেন; কিন্তু এ শিল্পে গ্রীকপ্রভাব এ যাবৎ অনুমিত হয় নাই। সুতরাং এ পরিকল্পনা গ্রীক-প্রভাবশূন্য বলিয়াই ধরিয়া লইতে হয়। ডাঃ ফোগেল কানিংহামের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন (৩৪) যে, বৌদ্ধ-শিল্পে মথুরার প্রভাব বিশেষ

(৩৩) Dr, Vogel's Catalogue of the Lucknow Museum, pp, 24-25.

(৩৪) Catalogue of the Archæological Museum at Mathura, p. 28.

ভাবে প্রকট এবং মথুরায় নির্ম্মিত বৌদ্ধমূর্ত্তিসমূহ উত্তরভারতের বিভিন্ন স্থানে নীত হইত। শিল্পীর মারফতে ভারতের একপ্রদেশের শিল্পপদ্ধতির বাঁধাছাঁচগুলি যে অন্য প্রদেশে পহুছিত, এ অনুমান অসঙ্গত না হইলেও মথুরার মূর্ত্তি, উত্তর হইতে ভারতের দক্ষিণপূর্ব্বাংশে, উৎকলপ্রদেশেও যে আমদানি হইত, তাহার কোনও সাক্ষাৎ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। উড়িয়া স্থপতি স্বদেশের স্থাপত্য-প্রণালীর বৈশিষ্ট্যে যেরূপ নিজ প্রতিভার সম্যক বিকাশলাভ করাইতে সমর্থ হইয়াছে, ভাস্কর্য্যেও তাহা অপেক্ষা কম পারদর্শিতা প্রদর্শন করে নাই। বঙ্গদেশে উড়িয়া স্থাপত্য-প্রথা বাঁকুড়া পর্য্যন্ত সংক্রমিত হইয়াছিল। ১৬২২-২৩ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত বিষ্ণুপুরের মল্লেশ্বর মন্দির আজিও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে (৩৫)। বঙ্গদেশের ভাস্কর্য্য-নিদর্শনের সহিত উড়িষ্যার খোদিত চিত্রগুলির এখনও তুলনাগত আলোচনা হয় নাই, হইলে ধীমান বীতপালের দেশবাসীর নিকট উড়িয়া ভাস্করের যে মাথা হেট করার বিশেষ কোনও কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, এইরূপই বিশ্বাস জন্মে।

আমরা উৎকল-ভাস্কর্য্যের আলোচনা করিতে গিয়া মূর্ত্তি ও খোদিত চিত্র প্রভৃতিরই উল্লেখ করিয়াছি; কিন্তু স্থাপত্য-অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত যে কারুকার্য্য ও কলাকৌশল কুড্যস্তম্ভগাত্রে সন্নিবিষ্ট মাল্যাকৃতি ডালিতে এবং 'ফুললতা', 'নটীলতা', 'পত্রলতা' প্রভৃতি লতার আবর্ত্তনে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে অভিজ্ঞ সমালোচকের মতে চারুশিল্পের এ শাখায় গ্রীক-শিল্পী অপেক্ষা উড়িয়া কারিকরেরই কৃতিত্ব অধিক প্রকাশ পাইয়াছে (৩৬)। যাঁহারা প্রস্তর-মূর্ত্তির নির্ম্মাণ-ব্যাপারে গ্রীক আদর্শের প্রভাব স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, তাঁহারাও এই প্রসাধক কলা-কৌশলের মৌলিকতা যে ভারতীয় ভাস্করের নিজস্ব, তাহা অসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ সার্ জন্ মার্শাল মহোদয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যবোধ ও শোভা-সম্পাদন-কুশলতা ভারতীয় শিল্পে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যমান, তাহা উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত বিদেশীর নিকট ঋণস্বরূপ গৃহীত নহে (৩৭)। বুদ্ধগয়ার ভাস্কর্য্যে 'কীর্ত্তিমুখ', এবং 'বড়ঝাঁজি' নামক জলজ

(৩৫) J. A. S. B. 1909 (N. S.) p. 146.

(৩৬) M. Ganguly's Orissa and Her Remains, pp. 192-193.

(৩৭) Guide to Sanchi, p. 12,

উদ্ভিদের অনুকরণে উদ্ভাবিত, অলঙ্কারের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া, ভরসা করি, কেহ উৎকল-শিল্পের মৌলিক পরিকল্পনাগুলির সৌন্দর্য্যের কথা বিস্মৃত হইবেন না। ভুবনেশ্বর-স্থাপত্যে বিচিত্র কারুকার্য্যের দৃষ্টান্ত মুক্তেশ্বর মন্দিরের জালিকাটা জানালার চারি পাশেও বড় কম দেখা যায় না। 'হনুমন্ত'লতার চিত্রটি সর্ব্বাগ্রেই চোখে পড়িয়া যায়। পূর্ব্বেই 'ভুবনেশ্বর'-প্রসঙ্গে লিঙ্গরাজ-মন্দিরের ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে; সুতরাং এ উপলক্ষে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মুক্তেশ্বর-মন্দিরের কারুকার্য্য-বহুল পীঠ, ভূমি, উদ্গতস্তম্ভ প্রভৃতি লক্ষ্য করিলেই, এ দেউল যে ওড্রস্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য-নিদর্শনের মধ্যমণি-স্বরূপ, এ উক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়।

বাঙ্গালী চারুশিল্পের উদ্বোধন প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে; কিন্তু শুদ্ধান্তঃপুরের নিভৃত কোণে বাঙ্গালী বধূরা মাঙ্গলিক কার্য্যোপলক্ষে এখনও যে সকল আলিপনা অঙ্কিত করেন, তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত লতামণ্ডনাদির যেন জ্ঞাতিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। কলিকাতায় চিৎপুর রোডে পাথুরিয়াঘাটার সন্নিকটে এখনও কয়েকজন ভাস্কর বঙ্গদেশে প্রচলিত দুই চারি প্রকার বিগ্রহ পাথর খুদিয়া তৈয়ার করিতে পারে শুনিয়াছি। কলিকাতার বাহিরে, সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে এক কাঁটোয়া ও তৎসন্নিহিত ডাঁইহাটে সামান্য রকম প্রস্তর-নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া থাকে (৩৯); কিন্তু উড়িষ্যার ভাস্করেরা এখনও তাহাদের বংশ-পরম্পরাগত দক্ষতা অনেকাংশে অবিকৃত ভাবে রক্ষা করিয়াছে।

ভুবনেশ্বরে যে সকল উড়িয়া শিল্পী রাজারাণী, মুক্তেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, ভাস্করেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, পরশুরামেশ্বর প্রভৃতি মন্দির মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা অনেক ক্ষেত্রেই ভাঙ্গা "মূরত"গুলির স্থানে নিজেদের নির্ম্মিত সেই প্রকার মূর্ত্তি বসাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। কোণার্ক-মন্দির সংস্কারেও ইহারা যথেষ্ট কার্য্যতৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছে। শ্রীযুক্ত সার্ জন মার্শাল মহোদয় এই উপলক্ষে ভুবনেশ্বরের জনৈক আধুনিক শিল্পী-রচিত কারুকার্য্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহার ১৯০২-৩ সালের রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন (পৃঃ ৪৬), "প্রাচীন আদর্শের তুলনায় এ ব্যক্তির কার্য্য বড় অধিক অপকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না, কেবল মনুষ্য-মূর্ত্তি ও পাণ্ডবমূর্ত্তি-সমূহে কিঞ্চিৎ সৌন্দর্য্যের অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।" ভারতে আধুনিক শিল্পীদিগের মধ্যে, রাজপুতানা ও পঞ্জাবে বালিয়া-পাথরের উপর স্থাপত্য-

(৩৯) Havell's Monograph on Stonecarving in Bengal, p. 16.

অলঙ্কার-হিসাবে নানারূপ নক্সা কাটা হইয়া থাকে ; কিন্তু উচ্চাবচ তক্ষণের গুণে, আলো ও ছায়ার সমাবেশে, যে সৌন্দর্য্যের উদ্ভব হয়, উড়িষ্যাদিগের ন্যায় উত্তরাপথের ভাস্করেরা এ বিদ্যায় সেরূপ পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে নাই। শ্রীযুক্ত হেভেল লিখিয়াছেন, গত পনর-বিশ বৎসরের মধ্যে চিন্তামণি মহাপাত্র, মহাদেব মহারাণা, কপিল মহাপাত্র কয়েকটি সুন্দর সুন্দর পাথরে খোদাই করা দরওয়াজা (doorway) প্রস্তুত করিয়াছে। পুরী-তীর্থের "এমার মঠ" নামক বৈষ্ণব আশ্রমের প্রবেশ-দ্বারগুলি ইউরোপের মধ্যযুগের গথিক ধর্ম্ম-মন্দিরের ভাস্কর্য্যের সহিত অনায়াসেই তুলনা করা যাইতে পারে (৪০)। মাত্র পঞ্চাশ মুদ্রা ব্যয়ে যেরূপ সুন্দর প্রস্তরখোদিত স্তম্ভ উড়িয়া কারিকর তৈয়ার করিয়া থাকে, তাহার উচ্চ অঙ্গের কারুকার্য্য দেখিলে বাস্তবিকই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। (Plate lV. Mr. Havell's Monograph) নরম পাথর 'সোপ ষ্টোনে' প্রস্তুত স্বল্প মূল্যের মূর্ত্তিগুলির মধ্যেও দুই একটি নমুনা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা এরূপ মূর্ত্তি শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ দুই একটি বিপণিতে বিক্রীত হইতে দেখিয়াছি। শ্রীযুক্ত হেভেল এইরূপ একটি খেলানায় শ্রীকৃষ্ণ, গোপিকা-বৃন্দ ও ধেনু প্রভৃতির মূর্ত্তিসমূহের বিন্যাস-পারিপাট্য ও খোদাইয়ের নৈপুণ্য দেখিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

ললিত-কলার অন্যান্য শাখায়ও উড়িয়াদিগের পারদর্শিতা বড় কম ছিল বলিয়া বোধ হয় না। হস্তলিখিত পুথি প্রভৃতি চিত্রণে উৎকল-শিল্পী বেশ অভ্যস্ত ছিল বলিয়াই মনে হয়। স্বর্গীয় হাণ্টার মহোদয়ের উড়িষ্যা-বিষয়ক গ্রন্থে উড়িয়া পুথি হইতে গৃহীত একখানি চিত্রের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে (Hunter's Orissa, vol. I, p. 167)। সম্প্রতি বিহার ও উড়িষ্যার প্রত্ন-তত্ত্বানুসন্ধান-বিষয়ক সমিতির মুখপত্রে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উড়িষ্যা-দেশীয় এক অভিনব শিল্প-নিদর্শনের যে চিত্তাকর্ষক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে এতদ্দেশীয় ব্যবহারিক জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যাদি অবগত হওয়া যায় (J. B. O. R. S. vol. V, Pt III, p. 325)।

উক্ত বিবরণীতে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইয়াছেন যে 'কোক্কা' নামক ললিতকলা-বিষয়ক জাপানী পত্রিকার ১১৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 'চাইনিজ কেলিকো' নামে অভিহিত ৬ সংখ্যক চিত্রটি চীনা কেলিকো ছিটের সহিত একবারেই সম্পর্ক-শূন্য ; বস্তুতঃ উহা যে ভারতীয় এবং

(40) Stonecarvining in Bengal. p, 5,

সম্ভবতঃ উড়িষ্যাদেশেই নির্ম্মিত, তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। ছিটের চিত্রে যে সকল স্ত্রীমূর্ত্তি দেখা যায়, পুরাতন উড়িয়া-চিত্র-নিহিত রমণীগণের সহিত সেই গুলির সুস্পষ্ট সাদৃশ্য আছে (Ibid, Plate I)। ছিটের উপরিভাগস্থ মন্দির-শ্রেণীর নক্সায় যে সকল 'শিখর' ও 'বিমান' প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতেও উড়িয়া স্থাপত্যের লক্ষণাদি বিশেষ-ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। চিত্রস্থ একটি 'কীর্ত্তিমুখ' অলঙ্কারের উপরিভাগে 'ত্রিপত্র' খিলানের (trefoil arch) উপর সন্নিবিষ্ট যে প্রকার মন্দিরচূড়া দেখিতে পাই, তাহাও উড়িষ্যার দেউলসমূহের ন্যায় উত্তরাপথের স্থাপত্য-প্রথানুযায়ী। চিত্রে অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত বৃক্ষগুলি নারিকেল ও খর্জ্জুর-জাতীয়। উড়িষ্যার বাণপুর অঞ্চলে এ সকল বৃক্ষ যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে। অধিকন্তু নক্সার উপরিভাগে মন্দিরচূড়া-সান্নিধ্যে সন্নিবিষ্ট বানরাদি ও বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট কলাপীসমূহ অঙ্কিত। এই সকল কারণে এই সুন্দর বস্ত্রখণ্ড যে ভারতে সৃষ্ট, তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। চিত্রের অন্তর্গত জটাজুটধারী দুইটি সাধুমূর্ত্তির ললাটে বৈষ্ণবদিগের ন্যায় তিলকচিহ্নও রহিয়াছে। ইহা ছাড়া দেবমূর্ত্তির মধ্যে 'গণপতি' মধ্যস্থলেই বিরাজিত এবং উপরের সারির চতুর্থমূর্ত্তিটি কিন্নরাকৃতি বলিয়াই মনে হয়। গণেশ দাক্ষিণাত্যে বিশেষতঃ ত্রিবাঙ্কুরে পরমাত্মাভাবে শিব ও হরি অপেক্ষা অধিক বরেণ্য (৪১) হইলেও উড়িষ্যায় অপরিচিত নহেন। জগন্নাথদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে অবস্থিত গণেশমূর্ত্তি যে অদ্যাবধি পূজিত হইয়া থাকে এবং গণেশের দুইটি বিভিন্ন মন্দিরই যে তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা শ্রীমন্দির-পরিক্রমা অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। 'গণপতি' বৌদ্ধ মহাযান-মতাবলম্বীদিগের দেবতা বলিয়া পরিগণিত বটে এবং চীনদেশে গণেশাকৃতি-মূর্ত্তি অপরিজ্ঞাত না হইলেও (৪২) পূর্ব্বোল্লিখিত চিত্রের নরনারীদিগের আকৃতি-প্রকৃতি, পোষাক-পরিচ্ছদ সমস্তই যে ভারতীয়, তাহা নিঃসন্দেহরূপে বলা যাইতে পারে। কেবল একটি আপত্তি এই যে, পুরুষমূর্ত্তিগুলির পোষাক উড়িয়া ধরণের নহে, দেখিলে উচ্চবংশীয় বা

(৪১) উপাসনা, আশ্বিন ১৩২৬, পৃঃ ৩৬৯।

(৪২) শ্রীযুক্ত এদুয়ার্দ শাভান (Edouard Chavannes) রচিত Art Asiatica গ্রন্থের ৩৬শ চিত্রে (Planche XXXVI, Tome II) একটি গণেশ-সদৃশ মূর্ত্তি (Genie des elephants) নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা বিনায়ক-মহাযানপন্থীদিগের দেবতারূপে পরিগণিত।

রাজকুলোদ্ভূত দক্ষিণী বা মহারাষ্ট্রীয় বলিয়া মনে হয়। উড়িষ্যার গঙ্গরাজগণ দক্ষিণী চোলবংশ হইতে উদ্ভূত; পরিচ্ছদে দক্ষিণী-প্রভাব এ কারণেও যে না হইতে পারে, তাহা নহে। মহারাষ্ট্রগণও উড়িষ্যাদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। এই ছিটখণ্ডটি তাঁহাদের রাজত্বকালেই নির্ম্মিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমিত হইলে, মহারাষ্ট্রীয় পরিচ্ছদের সাদৃশ্য চিত্রে অনুকৃত হওয়া অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইবে না। প্রাচীন কলিঙ্গ হইতে এইরূপ বস্ত্রনির্ম্মাণপ্রথা যে দক্ষিণ-ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করিবার প্রধান কারণ এই যে, প্রাচীন 'তামিল' ভাষায় 'কলিঙ্গ' শব্দ এইপ্রকার বস্ত্রবাচক অর্থেই ব্যবহৃত হইত এবং কথিত আছে যে, উড়িষ্যার সূক্ষ্ম মস্‌লিন ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজার নিকট উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরিত হইত। শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে এই তথাকথিত চীনাবস্ত্রখণ্ডটি গঙ্গরাজবংশের রাজত্বকালে ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দের মধ্যভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল (Ibid, p, 330)। ইহা দক্ষিণদেশের মসুলিপট্টনেরই হউক বা উৎকলেরই হউক, ইহাতে ললিত-কলা সম্পর্কীয় নক্সায় মন্দির-স্থাপত্যের যে সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা বিশেষ কৌতূহলকর সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন যে, আধুনিক ভুবনেশ্বরই প্রাচীনকালের কলিঙ্গনগরী। আমরা অবগত হইয়াছি, ভুবনেশ্বরে এখন আর কোনও প্রকার ছিট নির্ম্মিত হয় না; এখন যা কিছু কারুকার্য্য পানগুণ্ডির 'বটুয়াতে'ই পর্য্যবসিত। কিন্তু উৎসাহ পাইলে যে কলিঙ্গের এই প্রাচীন শিল্প আধুনিক উড়িষ্যায় পুনরুজ্জীবিত না হইতে পারে, তাহা কে বলিবে?

শ্রীগুরুদাস সরকার

রামগোপাল ঘোষ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ডিরোজিও ও শিক্ষার ফল।

Lyceumএ বৃদ্ধ সক্রেটিসের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মাণিকতলার বাগানে যুবক ডিরোজিও তাঁহার ছাত্রদিগকে পাশ্চাত্য চিন্তার নূতন আলোকে যে নূতন পন্থা দেখাইয়াছিলেন, তাহা হিন্দুকলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণের মনোনীত হয় নাই। তাঁহার শিক্ষায় ছাত্রেরা আচারভ্রষ্ট ও নীতিভ্রষ্ট হইয়াছে, এই বলিয়া দেশীয় কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিবার নিমিত্ত হিন্দুকলেজের উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষদিগকে অনুরোধ করেন।

এই ঘটনার কিঞ্চিৎপূর্ব্বে অ্যামেরিকা হইতে (Thomas Paine) টমাস পেন লিখিত "The Age of Reason" নামক পুস্তক ডিরোজিওর ছাত্র-দিগের হস্তগত হয়। টমাস পেন (১৭৩৭-১৮০২ খৃষ্টাব্দ) ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন ও পরে অ্যামেরিকায় গমন করেন। "Common Sense" নামক গ্রন্থে ইনি ঔপনিবেশিক বিদ্রোহের পোষকতা করেন এবং Burke লিখিত French Revolutionএর প্রত্যুত্তর স্বরূপ "Rights of Man" লিখিয়া ফরাসী দেশের প্রশংসা লাভ করেন। "The Age of Reason" (১৭৯৪-৯৫ খৃঃ) নামক গ্রন্থে তিনি প্রত্যাদেশ-মূলক ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিয়া খৃষ্টান ধর্ম্ম ও নাস্তিকবাদের প্রতিবাদ করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে, একটি সমস্ত পুস্তকাগারের চার্চ্চ বহির সাহায্যে অবসর মত লিখিয়াও, কোন বাইবেল-বিশ্বাসী ব্যক্তি তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিবেন না। ফরাসী ও অ্যামে-রিকান উভয় বিপ্লবের সহিতই তাঁহার সংস্রব ছিল এবং রুসো (Rousseau)র নামের অপেক্ষা টমপেনের নামের সহিত মানবের আদিম স্বত্বের (Rights of Man) এই অভিমত অধিক সংশ্লিষ্ট। ডিরোজিওর ছাত্রেরা সকলেই "The Age of Reason" যথাযথরূপে মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন। এখানে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, কলিকাতাস্থ ওয়েলিংটনের দত্তপরিবার-ভুক্ত খ্যাতনামা রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় তখন হিন্দুকলেজে পড়িতেন। তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হন, কিন্তু উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া সে ইচ্ছা

একেবারে ত্যাগ করেন। সে সময়ে গুজব উঠিয়াছিল যে, হিন্দুকলেজের সমস্ত মেধাবী ছাত্রই খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন।

যাহা হউক, যুবক শিক্ষক ডিরোজিও যে তাঁহার ছাত্রদিগকে নাস্তিকতাবাদ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ ছিল না। অন্যপক্ষে তাঁহার শ্রেষ্ঠ ছাত্রদিগের জীবনে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহার সকল ছাত্রেরই ভগবানে বিশ্বাস ছিল। রামগোপাল তৎকালে প্রচলিত সীমাবদ্ধ আহারাদির বিধি-নিষেধের বিপক্ষে বিদ্রোহিতা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার জীবনে কখনও ভগবানে-অবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পরে তাঁহার বাটীতে যে "বারমাসে তের পার্ব্বণ" হইত, তাহাই এরূপ আভাষেরও বিশিষ্ট প্রতিবাদ। আর একটি ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়; ইনি পরে দেশীয় খৃষ্টানদিগের মধ্যে ধার্ম্মিক বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছিলেন। মহেশচন্দ্র ঘোষের চরিত্র প্রথম বয়সে উচ্ছৃঙ্খল ছিল, এবং রামগোপাল সেইজন্য তাঁহার সহিত বড় মিশিতেন না; কিন্তু ডিরোজিওর প্রভাবে আসিয়া তাঁহার জীবনেও ধর্ম্মানুরাগ দেখা দিয়াছিল এবং চরিত্রগুণে তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। অধিকন্তু, হিন্দুকলেজের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী হরমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের নৈতিক অবস্থা ও সত্যবাদিতা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, ডিরোজিওর শিক্ষার গুণে কলেজের বাহিরে ছাত্রদিগের চরিত্র আদর্শ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল এবং শুধু সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক বিষয় নহে, সর্ব্ববিষয়েই তাহারা প্রশংসালাভ করিত ও সত্যবাদী বলিয়া পরিচিত হইত। বাস্তবিক "কলেজের ছাত্র" ইহা "সত্যের" প্রতিবাক্যরূপে ব্যবহৃত হইত। সাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাস ছিল ও দেশের মধ্যে এই কথা প্রচলিত ছিল এবং সে সময়ের কথা যাঁহাদের মনে আছে, তাঁহারা অবশ্য স্বীকার করিবেন যে, এই ছেলে মিথ্যা বলিতে পারে না, কারণ সে কলেজের ছাত্র। "Such was the force of his (Derozio's) insructions, that the conduct of the students out of the College was most examplary and gained them the applause of the outside world, not only in literary or scientific point of view, but what was of still greater importance, they were all considered men of truth. Indeed "the College boy" was a synonym for "truth" and it was a general belief and saying amongst our countrymen, which those that remember the

time, must acknowledge, that such a boy is incapable of falsehood because he is a College boy." এই মন্তব্যের সমর্থনে একটি ঘটনা না উল্লেখ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পিতামহের আদ্যশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণেরা বলিলেন যে, রামগোপাল নিষিদ্ধ বস্তু আহার করিয়াছেন, অতএব তাঁহারা এই শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিবেন না। এরূপ বিপদাপন্ন হইয়া পিতা তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, "গোপাল বল, তুমি নিষিদ্ধ বস্তু আহার কর নাই।" পিতার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার চক্ষুতে জল আসিল; কিন্তু তিনি বলিলেন "আমি মিথ্যা বলিতে পারিব না।" যাহা হউক, অল্প তৈলবটের মাহাত্ম্যে শ্রাদ্ধ সমাধা হইয়া গেল; কিন্তু সেই দিন হইতে গোবিন্দচন্দ্রের নামের পূর্ব্বে "গোখাদক" এই শব্দটি বসিল। পরন্তু তদবধি রামগোপালের দৃঢ়চরিত্র ও সত্যবাদিতা সকলেরই আদর্শ হইয়া উঠিল। তবে এখানে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, পরে তিনি তাঁহার অভ্যাগত অতিথিদিগের সৎকারে তাঁহাদের গোঘ্ননামের সার্থকতা করিতেন না—তাঁহার ডিনারের খাদ্য-তালিকা (menu)তে (beef) গোমাংস আদৌ থাকিত না।

ডিরোজিও তাঁহার অধ্যবসায়, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও উচ্চচিন্তায় হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের সম্মুখে যে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা অন্য শিক্ষক দ্বারা হয় নাই। ক্যাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন পরে সেক্সপীয়র এবং ইংরাজী সাহিত্যের আবৃত্তি ও ব্যাখ্যার বিশেষ গুণপনা দেখাইয়াছিলেন, সাহিত্যিক শিক্ষায় ক্যাপ্তেন সাহেব অদ্বিতীয় ছিলেন। মেকলে তাঁহার সেক্সপীয়রের আবৃত্তি শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে, হইতে পারে—তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত ব্যাপারই বিস্মৃত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার যে আবৃত্তি তিনি শুনিয়াছিলেন, তাহা কখনও বিস্মৃত হইবেন না। কিন্তু ছাত্রদিগের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য, তাহাদিগের মধ্যে প্রবল সহানুভূতি উদ্রেক করিবার জন্য, ডিরোজিওর নাম সর্ব্বদাই শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। তিনি তাঁহাদিগের মধ্যে বিবেকবুদ্ধির উন্মেষ করিয়া স্বাধীন ও নিরপেক্ষ চিন্তার বিকাশ করেন। ডিরোজিওর শিক্ষায় ছাত্রদিগের খাদ্যাদির আচার ও সামাজিক ব্যবহার যতই অসংযত হউক, তাঁহার দার্শনিকোচিত শিক্ষায় যে তাঁহাদের পৌরুষবৃত্তিগুলির পরিণতি করিয়া পরে তাঁহাদিগকে দেশাত্মবোধে প্রণোদিত করিয়াছিল, উত্তর কালের অভিমত তাহার সাক্ষ্য। মাইকেল-জীবনীতে যোগীন্দ্রনাথ বসু এই উভয় শিক্ষকের যে তুলনা করিয়াছেন, তাহার কতকাংশ আমরা গ্রহণ করিলাম। রিচার্ডসনের শিক্ষায়

সাহিত্যের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হইত, ডিরোজিওর শিক্ষায় শিক্ষিতের চরিত্র গঠিত হইত; রিচার্ডসনের শিক্ষায় কেবল সাহিত্যের বিমল রসাস্বাদ, ডিরোজিওর শিক্ষায় আমূল যুক্তি ও বিচারের অনুশীলন হইত। সেজন্য রিচার্ডসনের ছাত্রেরা বিদ্বান ও সুলেখক বলিয়া উত্তর কালে পরিচিত হন;—প্যারীচরণ সরকার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু, ভোলানাথ চন্দ্র প্রভৃতি রিচার্ডসনের ছাত্র। তাঁহারা সকলেই পণ্ডিত ও সুলেখক,—প্যারীচরণ সরকার, রাজনারায়ণ বসু সমাজ-সংস্কারক। ডিরোজিওর ছাত্রদিগের মধ্যে অধিকাংশই নির্ভীক সমাজ-সংস্কারক ও স্বাধীন-মতাবলম্বী;—রামগোপাল, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারিচাঁদ মিত্র, ইঁহারা প্রত্যেকেই রাজনীতিজ্ঞ ও সমাজসংস্কারের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। ডিরোজিওর ছাত্রদিগের পাণ্ডিত্য অপেক্ষা, সংস্কারের জন্য অধিক খ্যাতি। প্রথম হইতেই তাই ডিরোজিওর শিক্ষা সমাজের তদানীন্তন কান্তিক কবাটে আপনার শক্তি প্রযুক্ত করিয়াছিল, সেইজন্য সমাজ এত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ছাত্রদিগের অভিভাবকেরা ভাবিয়াছিলেন যে, ডিরোজিও তাঁহাদের সুকুমারমতি সন্তানদিগের মতিগতি বিপথগামী করিতেছেন, সেই জন্য ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে হিন্দুকলেজের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহাকে কর্ম্মত্যাগ করাইতে বাধ্য করেন। তিনি যদিও তাঁহার তথাকথিত দোষের যথাযথ প্রতিবাদ করেন, তথাপি তাহা গৃহীত হয় নাই। হিন্দুসমাজ তখন সহস্র প্রকার আচারদ্বারা আপনাকে সতর্কভাবে রক্ষা করিতেছিল এবং অধিকাংশ ব্যক্তিই পোষাক পরিচ্ছদ, আদব কায়দায় মুসলমানদিগকে অনুকরণ করিয়া গৌরবান্বিত বিবেচনা করিতেছিলেন;—'পতঙ্গ'বাজী, বুলবুল এবং মেড়ার লড়াইয়ে এবং বাইজীর সঙ্গীতে 'সোভানাল্লা' দিতেছিলেন। শিক্ষিতেরা আরবী ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়া, সুন্দর বয়েদ আওড়াইতেছিলেন,—কাবা, আচকান, আমামা প্রভৃতি পরিধান করিয়া, মাথায় 'বাব্‌রী চুল' রাখিয়া, ধনী-পরিবারগুলি প্রতিষ্ঠা ও অভিজাত্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছিলেন। এইরূপ সময়ে ইংরাজী চলন, ইংরাজী অসন, ইংরাজী ভাষণের প্রবর্ত্তনে সামাজিক অবস্থার গতানুগতিকে যে বাধা পায়, তাহাতে একটি বিপ্লব সূচিত হয়। ইহাতে সমাজের মস্তক বিচলিত হইয়া উঠে। প্রতিকারকামী এই হিন্দুসমাজের প্রথম শাসনের ফল ডিরোজিওর কর্ম্মচ্যুতি।

দ্বাবিংশ বৎসর বয়সে ডিরোজিও হিন্দুকলেজ ত্যাগ করেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা সহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং এইখানে ধর্ম্মতলা-ষ্ট্রীটে, কবি, দার্শনিক, সমাচার-পত্রাদির লেখক, শিক্ষক ডেভিড ড্রামণ্ডের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তিনি গুরুর একটি গুণেও বঞ্চিত হন নাই। হিন্দুকলেজে অধ্যাপনা কালে তিনি "Hesperus" নামক একখানি পত্রিকা সম্পাদন করেন; অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া "ইষ্ট ইণ্ডিয়া" নামক দৈনিক পত্রিকা সম্পাদন করেন। এখনকার অ্যাংগ্লোইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় সে সময় ইষ্টইণ্ডিয়ান নামে অভিহিত হইত; এখনও রেলওয়ে চাকরীতে তাঁহাদিগের এই নামই প্রচলিত আছে। ইহার পরে ডিরোজিও যে কয়মাস জীবিত ছিলেন, তাহা তিনি উক্ত সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য প্রত্যেক কার্য্যে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ছাত্রেরা কিন্তু তাঁহার সাহায্য ত্যাগ করেন নাই,—বিষম ঝড়-জল মাথায় করিয়াও তাঁহারা ডিরোজিওর বাটিতে নিত্য সমবেত হইতেন। গুরুশিষ্যে এত ভালবাসা নিতান্তই বিরল। কর্ম্মত্যাগের পর তাঁহার অবস্থান্তর ঘটে, ধনী ছাত্রেরা তাঁহাকে সে সময় যথেষ্ট সাহায্য করেন। কিন্তু অচিরে তাঁহার দুঃখের অবসান হয়। কর্ম্মত্যাগের একবৎসরের মধ্যে তিনি ওলাউঠা-রোগে আক্রান্ত হন। পীড়ার সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণমোহন, রামগোপাল, দক্ষিণারঞ্জন, মহেশচন্দ্র প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যেরা আসিয়া দিবারাত্র তাঁহার শুশ্রূষা করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ২৩শে ডিসেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। 'ফকির অফ জাঙ্গীরা'য় তিনি ভারতভূমিকে স্বদেশ বলিয়া সম্বোধন করেন এবং পতিত ভারতভূমির জন্য পুস্তকখানি উৎসর্গ করেন। দুঃখের বিষয়, এরূপ শিক্ষকের কোন স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত হয় নাই।

ডিরোজিওর কর্ম্মত্যাগের বৎসরে তাঁহার প্রিয় শিষ্যেরা অনেকেই হিন্দুকলেজ ত্যাগ করেন। সেই সময় বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৪১৫ হইতে হ্রাস পাইয়া ৩১৯ জন হয়। সাংসারিক অবস্থার উন্নতির জন্য রামগোপালেরও এই সময়ে অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন হয়। পিতা গোবিন্দচন্দ্র ইতিপূর্ব্বেই পুত্রের জন্য একটি দ্বাদশ মুদ্রা বেতনের চাকুরী যোগাড় করিয়াছিলেন। কিন্তু নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত রামগোপাল, পরে যিনি, এদেশবাসী যাহাতে উচ্চপদ ও অধিক বেতন লাভ করে, তজ্জন্য সচেষ্ট ছিলেন, এবং কোর্ট অফ প্রোপ্রাইটারের সভ্য John Sullivanএর ধন্যবাদ-সভায় ভারতবাসীর উচ্চ-বেতন ও উচ্চ-অধিকার-লাভের জন্য বিশেষ যুক্তি প্রদর্শন করেন, তিনি

স্বয়ং সে অল্পবেতনের চাকুরী গ্রহণ করেন নাই। ডিরোজিও যখন বিদ্যালয় ত্যাগ করেন, তখন রামগোপাল কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। এই ছাত্রপ্রিয় শিক্ষক হিন্দুকলেজে আরও অধিককাল অধ্যাপনা করিলে, হয়ত রামগোপাল প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিতে পারিতেন; কিন্তু ঘটনাবশে তাহা হয় নাই,—তিনি ১৮৩১ খৃষ্টাব্দেই বিদ্যালয় ত্যাগ করেন।

ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে ঠনঠনিয়া-নিবাসী ভোলানাথ মিত্রের কন্যা প্যারীমোহিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ভোলানাথ দাতারাম মিত্রের কনিষ্ঠপুত্র। কলিকাতাস্থ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর দাতারামের বৃহৎ বসতবাটি ছিল। পরে মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা সে বাটি ক্রয় করিয়া বাস করেন।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রিয়নাথ কর।

সঙ্গীত-সংগ্রাম

হাফ্-আখড়াই, পাঁচালী, কবি ও তরজা, এই চারিটী নিয়ে কিছুদিন আগে, মর্‌সুমে ও গরমর্‌সুমে,—অর্থাৎ পূজাপার্ব্বণে ও সুখ-সমাধায়, ভদ্রলোকের বাড়ীতে সৌখীন সম্প্রদায়েরা বড়ই আমোদ উপভোগ কর্‌বার অবকাশ পেতেন। এই চারি জাতীয় সঙ্গীত-সংগ্রামে এত অধিক শ্রোতার সমবেত হ'ত, তা বল্‌বার নয়।

হাফ্-আখড়াই উঠে গেছে,—সে আজ অনেক দিনের কথা; কিন্তু পাঁচালীটা এখনও ফল্গুর মত অন্তঃশীলা বইছে। তবে সখের কবি ও তরজা উঠে গিয়ে পেশাদারীর খাতায় নাম লিখিয়েছে।

কলিকাতায় "সঙ্গীত সমাজের" প্রতিষ্ঠায় অনেক আশা মনে জেগেছিল। মনে হয়েছিল, হয়তো বা আবার সঙ্গীতের চর্চ্চা এখানে পুরাদস্তর হবে, চাই কি সঙ্গীতের দুর্গোৎসব হলেও হ'তে পারে; কিন্তু অবশেষে দেখা গেল, যে সেটী কার্ত্তিক পূজায় পর্য্যবসিত হয়েছে।

আশার ঘরে আশঙ্কার আসা-যাওয়া হচ্ছে, এমন সময়ে Halley's Comet এসে এখানে একটু সঙ্গীতের নাড়া চাড়া বাড়ল। "নাড়ু নাড়িলেই

গুঁড়া পড়ে" এই একটী প্রবাদ আছে। কিন্তু গুঁড়া পড়িল না; পড়িবে কোথা হইতে, গুঁড়া থাকিলে ত পড়িবে। যা কিছু ছিল, দুরদৃষ্ট বশতঃ গুঁড়ার অধিকারীরা চাটিয়া সাফ করিতে ব্যস্ত, সুতরাং নাড়ু নাড়াই সার হইল।

তবে আজকাল একটী ব্যাপার যে হচ্ছে, সেটা বেশ চাক্ষুষ দেখা যাচ্ছে, কাগজে কলমে সঙ্গীতের চর্চ্চার মক্‌স চলছে। এটী মন্দের ভাল বলতে হবে। বচন এবং কলম-সর্ব্বস্ব আমরা এর বেশী কি করতে পারি?

দুখানা আড়খেমটা বা একতালার ছন্দে গান বেন্ধে সুর বসিয়ে গাইতে শিখে বা শিখিয়ে ওস্তাদির বেলেস্তারায় যদি পার পাওয়া যে'ত, তা হলে নিশ্চিন্তে রাশিয়ানী ঘুম দেওয়া যেত, অর্থাৎ সোনার পালঙ্কের অঙ্কে, পালকের গদীর উপর, পালকের বালিশে মাথা রেখে শুয়ে, ভক্তি পূর্ব্বক একটু বেশী আরামে ঘুমোনো যেত। তারপর হঠাৎ একদিন জেগে উঠে দেখা যেত যে, সঙ্গীতের ভক্তরা ধুপ ধুনা জেলে শাঁখ ঘণ্টা বাজিয়ে পূজা কচ্ছে ও চামর ঢোলাচ্ছে। সাজ সরঞ্জাম সবই হিন্দুর ও বাজনা বাদ্যি সবই দেশী।

সঙ্গীতের উপর অশিক্ষিত স্বেচ্ছাচারের চরম অভিনয়ের যুগে, ত্রুটী বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। আঁবার তা যখন অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে দাঁড়ায়, তখন চক্ষু-লজ্জার মাথা খেয়ে নাম লেখাতে ভয় করে না বা পায় না। শাসন-নীতির বিধিব্যবস্থার টোল না খুল্‌লে আর উপায় থাকে না।

আমাদের দুরদৃষ্ট! আজ প্রফেসর কৌকব যদি জীবিত থাকতেন, তাহা হইলে গোঁড়ামীর হাত হ'তে অব্যাহতি পাইয়া হিন্দু সঙ্গীতের ধারাবাহিক তত্ত্ব ও তথ্য পত্রস্থ দেখিতে পাইতাম। "ওস্তাজদী" অর্থাৎ "কথ্যকজাতি," যাহারা বাইজীদের তালিম দেন, তাহাদের কৃপায় অনেক রকমে লঙ্কাকাণ্ড যে ঘটেছে, তা তাঁদের শিষ্যসেবকের দ্বারা বেশ প্রতিপন্ন হচ্ছে। তা'রা চাল বদলাতে গিয়ে, বিগড়ে দেননি বলে, মনকে আঁখিঠারা যায় না। চিরাগত অভ্যাসের উপর রংচড়ালে ঢং বদলায় মাত্র, তবে সেই রং যদি বিদেশী হয়, ত'হ'লে খাপ খায়না। সে রং ঝরে পড়েই; তখন ফিকে হয়ে যায়। চাল বদলান আলাদা কাজ।

বাণীর আশীর্ব্বাদ পেতে গেলে, সোণার কাঠী ছোঁয়ান শিখতে হয়, নইলে আশীর্ব্বাদটা উলটে কমলে-কামিনী হয়ে দাঁড়ায়। তবে হাঁ, একথা ঠিক, বাংলায় এখন ৺গঙ্গানারায়ণ চট্টো, ৺যদু ভট্টো, ৺রাধিকা দত্ত ও

৺বেণী ওস্তাদ ইত্যাদির মত লোক নাই। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত প্রায় উঠে গেছে বল্লেই হয়।

গন্ধর্ব্ব বেদ বা বিদ্যা যদি সামবেদ থেকে তুলে নেওয়া হয়ে থাকে, তা হলে সঙ্গীত বিদ্যাটা যে বিজ্ঞান নয়, একথা বড় গলা করে বলা যায় না। তা যদি না হ'ত, তা হ'লে সঙ্গীতের শাস্ত্র ও সংহিতা রচনা হত কি?

ধ্রুপদ গাইবার আগে আলাপ করা বিধেয়, এখন তা গাইয়ের অভাবে লোপ পেয়েছে। বাঁটোয়ারা বরাবরই ছিল ও আছে, তবে জলদেই যে বেশী কারদানী, তার কিছু মানে নেই। ঠায়ে, মধ্যলয়ে ও জলদে সব রকমেরই কাজ আছে।

আজকালকার থিয়েটারী সুর শুনে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, আর কিছু দিন পরে দেশী রাগরাগিণীগুলি ধ্বস্‌ভাঙ্গা বালুচরের মত দশা ঘটবে।

তানসেনের সঙ্গীতের আচার, বিচার ও পদ্ধতি অনুশীলন কল্লে বেশ বোঝা যায় যে, তিনি পারস্যের খাঁটী যাবনিক ঢং চালাতে ভরসা করেন নি। তবে আমীর খুস্‌রো অনেকদিন বাদে সে চেষ্টা করে, ততদূর সফল হন নি, যতদূর ইচ্ছা করেছিলেন।

আজকাল যারা দুখানা ধ্রুপদ, চারখানা খেয়াল ও দু একঁখানা টপ্পা ঠুংরী, তেলেনা গাইতে শিখে সুর বসাবার চেষ্টাচরিত্তির করেন, অধিকাংশ-স্থলে তাঁরা লয়কারীর উপর পাঁচখানা সুরের রাগিণীতে পাঁচখানা সুরের রাগের তাল ঢুকিয়ে হেকমতের কায়দা দেখান, সেখানে বংশপরিচয় "parentage" ক্ষুণ্ণ করে দাঁড়াতে গেলে, একান্ত ক্ষীণ হয়ে পড়বে, আমাদের এই ভারত সঙ্গীত। তখন বাইরের লোকে শুধু হাস্‌বেনা, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে। আর পরিচয় দিতে গেলে, ধোপা নাপিত বন্ধ হয়ে, হুঁকো রদ হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, হিণ্ডোলের ঠাটে বিক্রীত রেখাব দিয়ে পুরিয়ার ছব্বা দেখান যেমন। মারোয়ার রেখাব ত দূরের কথা।

এক ঠাটের তান, অন্য ঠাটে বসালে, নল্‌চে এবং খোল দুইই বদলে যায় ইত্যাদি।

আদালত আছে বৈকি, তা মানতেই হবে, কেননা সেখানে বিচার হয়। ভৈরবী ও বেহাগের মধ্যম ও নিখাদ যারা বিচার করে লাগায়, তাদের কাছে শিক্ষা দীক্ষা পেয়ে ঠোঁট ঠিক রেখে যারা গায়, বাজায়, তারাই বিচারক। পৈতা গাছটির খাতির করতেই হবে। ঘক্‌নার মান্য

যদি মান্‌তে হয়, তা হলে গায়ত্রীর মন্ত্রে শুধু ব্রাহ্মণের অধিকার কেন বলে? তবে ভ্রষ্টাচারীর পাল্লায় পড়লে ওস্তাজদী ও টোস্তাদজীতে মারামারী অবশ্যম্ভাবী। শুদ্ধ সালফ ও সঙ্কীরণ রাগরাগিণীর কথা শাস্ত্রেই বলেছে, সেখানে পাপের কথা নাই।

কবির কবিত্ব হিসাবে কপচানীর কথা নয়, এ সঙ্গীতের সার্ব্বভৌমিক স্বত্বাধিকারের কথা। শিক্ষাভিমানী সবজান্তাপ্রমুখ অতিবড় পণ্ডিত, যারা ঘেরাটোপে ঢাকা থাকলেই ভাল হয়, খলিফার চুমকুড়িতে যারা টাঙ্গান খাঁচার মধ্যে থেকে বুলী আওড়ায় ও শীষ দিয়ে গান গায়, তাদের গান এখনও সনন্দ পায়নি, যাতে করে মজলিস্ বা জলসায় ও মায়ফেলে গাওয়া যেতে পারে। বড় জোর প্রীতিভোজে ছেলেদের বৈঠকে গাওয়া চল্‌ছে। তার উপর থিয়েটার পর্য্যন্ত গড়িয়েছে। বাস্ ঐ পর্য্যন্ত।

জাঁক করে দু একজন বলেন, বাণীর মন্দিরে নির্ম্মাল্য আনতে দেশী সঙ্গীত হাঁটী-হাঁটী পা-পা করে চল্‌তে সুরু করেছে, সে অভিভাবকের নিষেধ মান্‌ছে না। উঠন্‌টুকু পার হ'তে দাও, তারপর সিঁড়ি থেকে সে যে গড়িয়ে পড়ে ঘাড়মুড় ভাঙ্গবেনা, সে দায়িত্বটা কেউ নিয়েছেন কি? এই দেশী যেদিন মার্গীতে পরিণত হবে বলে, যাঁরা বসে আছেন পথ চেয়ে, তাঁদের অগস্ত্যযাত্রা বলে ভ্রম হবার আগে, এই দেশী সত্য সত্যই, আজকালকার ছেলে মেয়েরা, যারা গান বাজনা শিখছে, তাদের কাছে চির বিদায় নেবে।

আগেকার সাধক ভক্তেরা ভাল ভাল ওস্তাদের কাছে রাগরাগিণীর শিক্ষা লাভ করে, গান বেঁধে সুর বসিয়ে গেছেন, সুতরাং আজও তা চল্‌ছে। ব্যতিক্রমে ট্যাকবার যোটী নেই। আগেকার রাগ রঙ্গ এখনও যে টেঁকে আছে, সে কেবল ভ্রষ্ট হয় নি বলে। নষ্টামিতে নাম লেখালে অন্তরীণ হতেই হবে।

সাধনায় শক্ত জব্দ হয়ে অধিকারে আসে, তখন তিন কুল মুক্ত হয়।

সঙ্গীতের বিষয়ে ইষু ধার্য্য কর্‌তে হ'লে গুণী হ'তে হবে, জ্ঞানী হ'তে হ'বে। ঔপপত্তিক ও ক্রিয়াসিদ্ধ এ'দুয়েতেই পোক্ত হ'তে হবে। না হলে মনগড়া কথায় কাগজ ভরালে, কাঠীর আঘাত সইতে হবেই। বিচার পরের কথা।

বাংলা গান রচনা করা হক, গাওয়া হ'ক, তাতে কারও কিছু বলবার কথা নেই, তবে দোহাই তাতে বিদেশী মেলতি ঢুকিওনা, তাহলে ট্যাংরা গেঁটে হয়ে পড়বে।

বিদেশী ডম্বল ভেঁজে অম্বলও হয়েছে, আর বল বাড়াতে গিয়ে, শরীরের অংশবিশেষে ছিনে পড়ে গেছে, তার অনেক দৃষ্টান্ত, প্রমাণ ইত্যাদি অঙ্গ-সৌষ্ঠবের হার্‌মনি রাখতে পারেনি।

হিন্দু সঙ্গীতের রাগরাগিণীর আলাপের সময়, যার নজর সাফ, সে বেশ বুঝতে পারে, তান কত রকমে ঘোরে, ফেরে ও বাড়ে। ওস্তাদেরা যাদের প্রীতির চোখে দেখেন, তাদের ছাড়া বড় একটা কারুকে বাৎলান না এই একটা মহা মুস্কিল। তাই অভিমানের পঞ্চ বদন এবং কাঠঠোকরা ও কাদাখোঁচারা বলেন "হিন্দুসঙ্গীত বলে যদি কোন পদার্থ থাকে, সে তার জাত বাঁচিয়ে চলুক; কারণ, তার প্রাণ নেই শুধু জাতই আছে। তবে সংশ্রবের গুণে সে আপনাকে বড় করেই পাবে।" কিন্তু কাজের মজা হচ্ছে এই যে, গানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবার সময় হিন্দুসঙ্গীতের স্থান-বিশেষে "সুষমা" বা "জবাকুসুম" ঢালতেই হবে। বিদেশের সোনার কাটী ছুঁইয়ে যদি তাকে বড় করে নিতে হয়, তা হলে কসরৎ করে যাদের আধার ডাগর হয়েছে, তাদের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত; কেননা, হিন্দুদের নিজেদের রাগরাগিণীর ধারণার স্থান ভরপুর ও টৈটুম্বুর হয়ে আছে। তাদের বড় একটা ভয় বা ভাবনা নেই,—তারা যে সনাতন জাতের প্রাণ আজও বাঁচিয়ে আছে, সেটা জগৎ কেন ব্রহ্মাণ্ড আজও দেখছে।

হালিচড়কো ওস্তাদজীরা একটু আধটু হালু চালু করেন, তারপর যখন একটু মত্ত হন, তখন বলবার ও লেখবার কুণ্ডয়ন থামাতে পারেন না। লিখতে গেলে ও বল্‌তে গেলে গল্প বেড়ে যায়ই। গল্পের যখন অল্প কিছু নয়, তখন কমলেখা দরে বিকোবে কেমন করে? ওস্তাদি তালিম না হ'লে, খেই ভুলে, গেয়ে সামঞ্জস্য রাখা বড়ই দায় হয়। সুতরাং নিজের সত্যাসত্যকে বাঁচাবার জন্য অনেক অবান্তর কথার অবতারণার চেষ্টা হয় ও শেষে দেশী ও বিদেশীর সংমিশ্রণে সাম্যের সিমেণ্টের পলস্তারার সাহায্য-ভিক্ষার প্রয়াস ফুটে ওঠে।

মুসলমান ওস্তাদেরা কখনও এমন কথা বলেন না যে, রাগরাগিণী সবই তাদের খানদানি, তাহ'লে জিল্লা, রিজলি ইত্যাদির মত সব নাম পালটে যেত।

যদি ধরা যায়, তানসেন হ'তে উত্তরাপথের সঙ্গীত যবনদোষে দুষ্ট, অতএব হিন্দুপদবাচ্য নয়, তা হলে দেখতে হবে, তানসেন কার শেষ

তালিমের সাগরেদ। সে যদি হিন্দু হয়, তাহ'লেওকি ওকথাটা বলা চল্‌বে? এতেও যদি দক্ষিণাপথের আচার্য্যিরা এবং তাদের পেটোয়ারা সমস্বরে "রামধন-দাদাকে জানিনা চিনিনা শুনিনা" ব'লে সুরথালে প্রতিবাদ করেন, তা'হলে তা'দের সঙ্গীতের প্রকাশিকায় রাগরাগিণীর সব নাম পালটালে কেন? ঘরের ভিরকুট-বিচি বেশী করে উদরস্থ করবে বলে? থাক্ সে ঢের কথা!

মার্গ ও দেশী নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবার দরকার নেই, শাস্ত্রে তার বিশদ ব্যাখ্যা নানা রকমে দিয়ে গেছে। তাদের অনেকের মতে গান্ধার গ্রামটা মার্গীর অনুকূলে সাক্ষাৎ দিয়ে গেছে। এখন মার্গীর গান্ধারটা ঠিক যেন বার্গীর মত উপে গেছে। এই গান্ধার গ্রাম তানসেন সাধনা করে-ছিলেন। তা তাঁর গানে প্রমাণ আছে। সে গান দু একজন জানে।

কথা-সাহিত্যের কারদানী দেখাবার জন্যে, হন্যে হয়ে সঙ্গীতের উপর মেহেরবাণী না করে অধিকারের সীমান্তর্গত অন্যকোন বিষয়ে হস্ত ও মস্তিষ্ক-ক্ষেপ করেন যাঁরা, তাঁরা বোধ হয় বুদ্ধিমান। কারণ হচ্ছে কি যে, বিছানার উপর শেখা সাঁতারে গঙ্গা পার হওয়া যায় না।

নানা মুনীর নানা মত একথা ঠিক। রত্নাকর—দামোদর—চিন্তামণি—কলাধর—পারিজাত—বিবোধ ইত্যাদি সবই তুবড়ী এবং ফুলও কেটেছে নানা রকম, যার যেমন হেক্‌মত, সে সেই ভাগে মশলা মিশিয়েছে; কিন্তু তাতে তো ছুঁচোবাজী হয়নি! বিলাতী মেলতীর বাষ্পও তাতে নেই। সেই ৫০৪০ তান, সেই গমক, সেই মুর্চ্ছনা, সেই খণ্ডমেরু বা মেরুখণ্ড অলঙ্কার সব তাতেই বজায় আছে; শ্রুতির হিসাবের একটু আধটু অদল বদল হয়েছে কেবল কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতে। কেউ বলেছেন শেষের শ্রুতিতে, কেউ বলেছেন প্রথম শ্রুতিতে সুরের অবস্থান, এই তফাৎ। তার কারণও আছে, মীমাংসাও যে নেই, এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ।

অলকা

শিবচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থা যে এক সময় ভাল ছিল, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ তাঁহার বিস্তৃত ভগ্ন অট্টালিকা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। সেই অতীত সৌভাগ্যের চিহ্নটুকুও যখন পাওনাদার বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় বিক্রয় করাইবার শেষ ব্যবস্থা দিয়া গেলেন, তখন তিনি একবার চাহিয়াও দেখিলেন না যে, এই নিদারুণ প্রস্তাবে সর্ব্বস্বহীন, রোগক্লিষ্ট শিবচরণের হৃদয়ে কতখানি আঘাত লাগিল। সর্ব্বস্বান্ত শিবচরণ শেষ সম্বল পৈতৃক বাড়ীখানা হারাইবার কথা শুনিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার নয়ন-সম্মুখে গৃহহীনের দুর্দ্দশার সহস্র ছবি ফুটিয়া উঠিল। মানসনেত্রে তিনি দেখিলেন, নিবিড় অন্ধকার-রাজ্যে নির্ব্বাসিত, গৃহহীন তিনি, ঘনবিটপী-বেষ্টিত এক বিশাল অরণ্যের একপ্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছেন! সেখানে আলো নাই, বাতাস নাই,—সব শূন্য, সব অন্ধকার। শুধু কন্যা অলকার স্নিগ্ধনয়ন-দুইটি উজ্জ্বল শুকতারার মত সেই নিবিড় অন্ধকারে আলো বিকীর্ণ করিতেছিল।

শিবচরণ যখন গভীর চিন্তায় তন্ময়, ঠিক সেই সময় বসন্তের সুখদ সমীর-ধারার মত চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া অলকা গৃহে প্রবেশ করিয়া কলকণ্ঠে ডাকিল, "বাবা।" কন্যার মধুর সম্বোধনে আজ আর পিতার তাপদগ্ধ হৃদয়টি জুড়াইল না, বরং এই স্নেহ-সম্বোধনে চিত্তের অগ্নিময়ী জ্বালা দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল। নৈরাশ্য-বায়ুতে দেহের সমস্ত রস আকর্ষণ করিয়া নয়নকোণে মেঘের সঞ্চার করিল। সেই স্বচ্ছ মেঘ ক্রমে অশ্রুর আকারে নয়ন-পথ দিয়া বৃষ্টিধারার ন্যায় ঝরিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। পিতার নিরুত্তর বিষণ্ণ মুখখানির দিকে চাহিয়া বিচলিত-হৃদয়ে, আকুল-কণ্ঠে অলকা কহিল, "বাবা, ঘুমিয়ে প'ড়ো না,-তোমার ঔষধ খাবার যে সময় হ'য়েছে"। শিবচরণ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ব্যথিত আর্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, "আর ঔষধ খাব না মা; শুধু ডাক্তারের দেনা বাড়ান বইত নয়? ও দুটো পয়সা তুলে রাখ অলকা, যখন গাছতলায় ব'সে ভিক্ষে করে খেতে হ'বে—"শিবচরণের কণ্ঠ বাষ্পভারে রুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না। পিতার মর্ম্মব্যথা হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া পিতৃপরায়ণা অলকার সুকোমল হৃদয়খানি দ্রবীভূত হইয়া উঠিল, তাহার আয়ত লোচনদ্বয় অশ্রুভার-সম্পর্কে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। অতি কষ্টে আত্ম-

সম্বরণ করিয়া যথাসাধ্য সহজ কণ্ঠেই সে কহিল, "বাবা, এত ভয় পাচ্ছ কেন? মুখুজ্জে জ্যাঠামশায় সত্যি ক'রেই কি আমাদের রাস্তায় তাড়িয়ে দেবেন? তাঁরও ত মানুষের শরীর?" কন্যার কথায় শিবচরণ একটু ক্ষোভের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "সুদখোরের আবার মানুষের শরীর হয় মা! বিশ্বনাথ মুখুজ্জেকে তুই বুঝতে পারিস্ নাই অলকা; ও টাকার জন্যে সব করতে পারে। একটা ছেলে—তাকে পর্য্যন্ত একটা পয়সা দিতে যার প্রাণ সরে না, সে আবার আমায় এ বাড়ীতে থাকতে দেবে?" অলকা ক্ষণকাল কি ভাবিয়া ধীর-কণ্ঠে কহিল, "না বাবা, লোকে জ্যাঠামশায়কে যতটা নিষ্ঠুর মনে ভাবে, আসলে তিনি তা' নন্। তুমি দেখে নিও, কখনও তিনি আমাদের এ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবেন না।" বলিয়াই অলকা পাশের ঘর হইতে পিতার জন্য ঔষধ আনিতে চলিয়া গেল।

শিবচরণ শয্যাপ্রান্তে বসিয়া অলকার আশ্বাসের কথা ভাবিতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতেই অলকা তাঁহার নিরাশ হৃদয়ে এমনি করিয়াই আশার সঞ্চার করিয়া আসিতেছে। তাহার স্থির-বুদ্ধির উপর তাঁহারও যে অগাধ বিশ্বাস। অলকা যখন বলিয়াছে, মুখুজ্জে আমাদিগকে বাড়ী হইতে উচ্ছেদ করিয়া দিবেন না। তখন আর চিন্তা কিসের? অপত্য-স্নেহমুগ্ধ পিতা কন্যার আশ্বাস-পূর্ণ বাক্যে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

(২)

অপরাহ্ণ হইতেই টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল, বর্ষার সন্ধ্যা। কালো কালো, খণ্ড খণ্ড মেঘে আকাশ ও ধরণীতল ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। পল্লীগ্রামে যে-যাহার-মতন সকাল-সকাল আহার-নিদ্রার আয়োজনে ব্যস্ত। সমস্ত দিনের কোলাহল থামিয়া আসিয়াছে; শুধু দূর হইতে নদীর পাড়ভাঙ্গার শব্দের সহিত ভেকের অবিশ্রান্ত কঠোর কণ্ঠধ্বনিতে ক্ষুদ্র পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল।

অলকা রান্নাঘরের কোণে বসিয়া পিতার জন্য লুচির ময়দা মাখিতেছিল। বাড়ীর পুরাতন দাসী অহল্যা সমস্ত দিনের কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া হরিনামের মালাটিতে অশান্ত মনকে অভিনিবিষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছিল।

প্রাঙ্গণ হইতে কে একজন ডাকিল, "শিবচরণ, ঘুমিয়েছ নাকি?" এ চটী-

জুতার বিচিত্র শব্দ এবং ভগ্ন গম্ভীর স্বর অলকা বা অহল্যার অপরিচিত নহে। অলকা মনে মনে একটু শঙ্কিত হইয়া তাড়াতাড়ি দুয়ার-সম্মুখে আসিয়া সবিনয় মৃদু-কণ্ঠে কহিল, "বাবা একটু ঘুমিয়েছেন, আপনি এইখানেই বসুন না জ্যাঠা-মশায়!" পরে অহল্যার দিকে চাহিয়া কহিল, "মাসী, ওই টুলখানা জ্যাঠা-মশায়কে পেতে দাও।"

আগন্তুক ঈষৎ বিরক্তির সহিত অপ্রসন্ন মুখে অহল্যা-প্রদত্ত টুলের উপর বসিয়া অলকাকে সম্বোধন করিয়া সবিদ্রূপ কণ্ঠে কহিলেন, "তোমার বাবার ত 'কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই'; আমার ত তা' নয় মা, পেটের চিন্তায় এই জল-ঝড়ের মধ্যেও বেরুতে হ'য়েছে। তোমার বাবা যখন সুদের টাকাও দিতে পারছে না, তখন বাড়ীর মায়া করলে আর চলবে কেন? আজ যা' হয় একটা ব্যবস্থা আমায় করতেই হ'বে,সেই জন্যেই এসেছি"।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা শুনিয়া অলকা নত-বদনে স্তব্ধ মূর্ত্তিটির মত তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল। যে প্রস্তাবনার আশঙ্কায় তাহার রোগ-ক্লিষ্ট পিতার হৃদয়ের ব্যথা আরও বাড়িয়া উঠে, তাঁহার হাসিমুখখানি মলিন হইয়া আইসে, আজ যে সেই অপ্রীতিকর সাংঘাতিক প্রসঙ্গ লইয়াই প্রৌঢ়-ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়াছেন! এখন করা যায় কি? অলকা যে, সব দৈন্য, সব অভাব হইতে তাহার পিতাকে পরিমুক্ত করিয়া নিরবচ্ছিন্ন শান্তি-সুখে নিশ্চিন্ত রাখিতে চায়! সে সব বাস্তবিকই কি এত কষ্টসাধ্য? তাহার সকল-প্রয়াস কি অবশেষে ব্যর্থ হইবে? অলকা বিষণ্ণ মুখে তেমনই ভাবে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। সে হিন্দুর ঘরের কুমারী-কন্যা, বাপের বুকে গুরুভার পাষাণের মত সে চাপিয়া রহিয়াছে, সেই চিন্তাতেই পিতা কত ম্রিয়মান হইয়া, কিরূপ আশাহত-চিত্তে দিন কাটাইতেছেন! তাহার উপর এই নূতন আঘাত, সেই রোগ-বিশুষ্ক শীর্ণ ভগ্ন-হৃদয়ে সহিবে কেন? আজ অলকা কি করিবে? তাহার ক্ষুদ্র প্রাণটুকু বিসর্জ্জন দিয়াও যদি বাপের ভিটা বজায় থাকে, সে তাহাতেও পশ্চাৎপদ নয়; ইহাতে সে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবে। কিন্তু এক্ষণে চিন্তা করিবার অবকাশই বা কোথায়?

মুখোপাধ্যায় অলকার চিন্তাপূর্ণ মুখখানির দিকে চাহিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, "শুধু-শুধু দাঁড়িয়ে রইলে কেন মা? দেখ তোমার বাবার সুখনিদ্রা ভঙ্গ হ'ল কি? আমায় আবার বাড়ী গিয়ে হাত পুড়িয়ে দুটী ভাতেভাত খেতে হ'বে ত?"

অলকা চমকিয়া উঠিল,অনিচ্ছাকৃত লঘু-পদক্ষেপে পিতার ঘরে যাইয়া দেখিল, তিনি সত্যই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। অলকা তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া অস্ফুট কণ্ঠে ডাকিল,"বাবা"! তাহার নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কর্ণেই পীড়া দিয়া উঠিল। গৃহের ক্ষীণ আলোকের ম্লান ছায়ায় পিতার রোগকাতর মুখখানির দিকে চাহিয়া অলকার দুই চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুর ধারা ছুটিল। সে আজ কেমন করিয়া ইঁহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া বলিবে, "তোমার পাওনাদার আসিয়া বলিতেছে, তুমি বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাও"? অলকা প্রাণান্তেও এ কথা বলিতে পারিবে না। না—কখনও নহে! সেই নির্জ্জন ঘরে দাঁড়াইয়া অলকা ক্ষণকাল কি চিন্তা করিল। তাহার পর ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে আসিয়া দুয়ারটি বন্ধ করিয়া, শান্ত অবিচলিত মুখে রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "বাবা একটু ঘুমিয়েছেন জ্যাঠামহাশয়, এখন আর তাঁকে ডাকবেন না। বাড়ী বিক্রীর কথা আজ আর তাঁকে ব'লে দরকার নেই। একে তাঁর রোগা শরীর, এ কথা শুনলে ভেঙ্গে পড়বেন।" একটু ইতস্ততঃ করিয়া হাতের বালা ও গলার হারগাছা খুলিতে খুলিতে ধীর-স্বরে অলকা কহিল, "আপনার বাকী সুদের টাকাক'টা, আপনি এই তিনগাছা বিক্রী করে নেবেন জ্যাঠামশায়। বাবাকে আর তাগাদা দেবেন না।" বলিয়া অলকা তাহার স্বর্গগতা মাতার চিহ্নের শেষ সম্বল বালা-দুইগাছা ও হারছড়াটি খুলিয়া টুলের একপার্শ্বে রাখিয়া দিল। ব্রাহ্মণ বিস্মিত-নয়নে ক্ষণকাল অলকার সরল সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে হার ও বালা লইয়া তাহার গুরুভার পরীক্ষা করিলেন। মনে মনে বোধ হয় প্রসন্ন হইয়া ভাবিলেন যে, আজকাল যা সোনার দাম, ফেলে-ছড়ে সাত আটশ' টাকা এতে হ'বে।" প্রকাশ্যে একটু সহানুভূতি-ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন, "কি করব মা, আমিও গরীব মানুষ; দুটো সুদের পয়সা নেড়ে-চেড়েই খাই। একটা ছেলে, সেটাও মানুষ হ'ল না। আমি বলি, চাকরী করে দুটো পয়সা ঘরে নিয়ে আয়, তা' ছেলেটা—এম্,এ কি না, ছাই তার বাপের মাথা—পড়া নিয়েই ব্যস্ত। আমার যে চলে কি ক'রে তা' বুঝবে না। তা—মা, তোমা-দেরও ত গাছতলায় তাড়িয়ে দিতে পারি না, আমার যে সবই দেখতে হয়।"

অহল্যা দাসী এতক্ষণ হরিনামের মালা হাতে লইয়া সবই দেখিতেছিল এবং কর্ণ পূরিয়া সেই বচনামৃত পান করিতেছিল। এত কথা শুনিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকার অপবাদ, ইতিপূর্ব্বে অহল্যার অতিবড় শত্রুও তাহাকে দিতে পারে নাই। সে তাহার ভাঙ্গা গলায় মিষ্টি মিষ্টি করিয়া কহিল, "দাদা-

ঠাকুরের বড় দয়া গো, এমন আর দেখিনি। এই ভরা সাঁঝের সময় বাছার আমার গা' থেকে গয়না নিতে চোরেরও যে হাত উঠ্‌ত না, তা—" অহল্যার কথা আর সম্পূর্ণ হইতে পারিল না। অলকা রোষপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "মাসী, চুপ কর। ও ঘর থেকে পাথরের থালাখানা তাড়াতাড়ি ক'রে এনে দাও তো"। অহল্যা অলকার মুখের দিকে একবার সচকিতে চাহিয়াই থালা আনিতে চলিয়া গেল। হাতে ক'রে 'মানুষ'-করা এই মেয়েটিকে সে যতখানি ভালবাসিত, তদপেক্ষা অনেক বেশীই ভয় করিত। অহল্যার ক্ষুরধার বাক্যবাণ, যাহার আঘাতে সমস্ত পাড়াটি অস্থির হইয়া উঠিত, তাহা শুধু সংযত থাকিত —অলকার কাছে।

অলকা অপ্রতিভ ব্রাহ্মণের লজ্জিত মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহবিগলিত মৃদুস্বরে কহিল, "বাড়ী গিয়ে আপনার হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হ'বে। আপনি এইখান থেকেই দু'খানা লুচি খেয়ে যান জ্যাঠামশায়। তরকারি রান্নাই আছে, উনুন জ্বালান র'য়েছে, চট্ ক'রে ভেজে দিচ্ছি।" মুখোপাধ্যায় চক্ষু তুলিতেই দেখিতে পাইলেন, অলকা বিনীত সকরুণ নয়নে তাঁহারই দিকে চাহিয়া আছে। বোধ হয় তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন, বাদ্‌লার রাত্রি, পরের পয়সায় গরম গরম লুচি জিনিষটা মন্দ নয়। আর এই সূত্রে একবেলার চারটি চাউলও বাঁচিবার সুবিধা হইবে। তিনি হিসাবী মানুষ, কাজেই অলকার প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলেন না। কিন্তু খাইতে বসিয়া তাঁহার যেন কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। যে মেয়েটি আজ সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার ন্যায় সস্নেহে, সাদরে তাঁহাকে খাওয়াইতেছে, আর তিনি কি না অতি বড় পাষণ্ডের ন্যায় তাহারই সেই শুভ্র কমনীয় হাতদু'টী হইতে শেষ সম্বলটুকুও অপহরণ করিয়া লইলেন! অলকার অনেক স্তুতি-মিনতি সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ উদরপূর্ত্তি করিয়া আহার করিতে পারিলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি আচমন করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। অহল্যা প্রত্যাবর্ত্তনশীল, স্থবির মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া বিদ্রূপের কণ্ঠে কহিল, "এত যত্ন-আত্যি ক'রে খাওয়ালে অলি,—কিন্তু 'ভবি ভোল্‌বার নয়।" অলকা শুধু তাহার রোষকষায়িত নয়ন-দুইটি অহল্যার মুখের উপর কয়েক মুহূর্ত্ত স্থাপিত করিয়া, আরব্ধ কার্য্যে চলিয়া গেল।

(৩)

বর্ষার মেঘ-নির্ম্মুক্ত অলস মধ্যাহ্ন। কয়েক দিনের বর্ষণের পর বেশ

একটু রৌদ্র উঠিয়াছে! কৃষকেরা হৃষ্টচিত্তে সদ্যঃপক্ক আউস ধান কাটিতেছে। তাহাদের গ্রাম্য মেঠোসুরের গীতধ্বনি শস্যশ্যামল ক্ষেত্রপ্রান্ত হইতে পল্লীর ছায়াশীতল বনপথে আনন্দের লহরী তুলিয়াছে। শিবচরণ তাঁহার শয়নঘরের চৌকিতে বসিয়া আলবোলায় তামাক টানিতেছিলেন। অলকা পিতার পদতলে বসিয়া পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিল। ধূমপানরত পিতা হঠাৎ কন্যার ভূষণবিহীন হাতখানির দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "তোমার হাতের বালা কোথায় মা? ও কি গলার হারও দেখ্‌ছি না!" পিতার প্রশ্নে অলকার প্রফুল্ল মুখখানি অকস্মাৎ বিবর্ণ হইয়া গেল। আজ কয়েক দিন সে যে কত চেষ্টায়, কত সাবধানে, তাহার ভূষণবিহীন দেহটি পিতার স্নেহময় চক্ষুর অন্তরালে লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে! কিন্তু আজ তাহার সব চেষ্টা, সব সাবধানতা ব্যর্থ হইয়া গেল! সে নত বদনে ভাবিতে লাগিল, কেমন করিয়া পিতার নিকটে সত্য কথা প্রকাশ করিবে! আসল কারণটা শুনিলে তাঁহার হৃদয় বেদনাভারে কিরূপ অভিভূত হইয়া পড়িবে, তাহা অলকা বেশ জানিত; কিন্তু মিথ্যা—তাহাই বা তাহার প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ এই সন্তানবৎসল পিতার নিকটে সে কেমন করিয়া কহিবে? কন্যার চিন্তাযুক্ত মুখের দিকে চাহিয়া পিতার কোন কথা বুঝিতে বাকী রহিল না। সুদখোর মুখোপাধ্যায় কেন যে নিত্যকর্ম্মের অঙ্গীভূত টাকার তাগাদা কয়েকদিন হইল বন্ধ করিয়াছেন, দিবালোকের মত স্পষ্টভাবে আজ সে কথার ভাবার্থ শিবচরণের হৃদয়ঙ্গম হইল। তিনি ব্যথিত, ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন "আমি সবই বুঝিয়াছি মা। আমি বেঁচে থাক্‌তেই পাওনাদার তোমার গায়ের গয়না খুলে নিয়ে যায়, এর চাইতে মর্ম্মান্তিক যাতনার কথা আমার আর কি আছে অলকা?" অলকা কথা কহিতে গেল, কিন্তু স্বর ফুটিল না। তাহার বক্ষের মধ্যে মর্ম্মভেদী তীব্র ব্যথা জাগিয়া উঠিল। পিতা, পুত্রী দুই জনেই তেমনই নত মস্তকে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

গৃহের অদূরে বর্ষাপুষ্ট একটি পুষ্পিত ছাতিমগাছের ঘন শাখায় লুকাইয়া একটি চাতক পাখী উদাস কোমল কণ্ঠে ডাকিতেছিল,সেই শব্দে অলকার চমক ভাঙ্গিল। সে তখন মলিন মুখে একটু মৃদু হাসি ফুটাইয়া কহিল, "বাবা, কাল যে তুমি মহাভারতের বনপর্ব্ব শুন্‌তে চেয়েছিলে? এখন তা হলে সেখানটা পড়ি?" পিতার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই অলকা তাকের উপর হইতে মহাভারতখানা লইয়া পড়িতে বসিল। অলকার মধুরকণ্ঠোচ্চারিত সুললিত পদাবলি, রাজরাজেশ্বরের বনগমন-কাহিনীগুলি শুনিতে শুনিতে শিবচরণের ভারাক্রান্ত মনটা তন্ময় হইয়া

গেল, তিনি আপনার সব চিন্তা ভুলিয়া গেলেন। পঞ্চ পাণ্ডবের দুঃখাবহ উপাখ্যান তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত চিত্তটিকে পূর্ণ করিয়া ফেলিল। যখন দিনের আলো ক্ষীণ হইল, পৃথিবী অন্ধকারে ঘনীভূত হইয়া উঠিল, সিদ্ধেশ্বরী-তলায় সন্ধ্যারতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, তখন পিতা পুত্রী দুই জনেই চমকিয়া উঠিলেন,—তাইত সন্ধ্যা যে হইয়া গিয়াছে!

(৪)

বর্ষাধারাসিক্ত মলিনা পৃথিবী শরতের উজ্জ্বল আলোকে হাসিয়া উঠিয়াছে। সকলেরই হৃদয়ে এবং মুখে আনন্দের আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু শিবচরণ ও অলকার হৃদয়ে আষাঢ়ের করাল মেঘের কালো ছায়া পড়িয়াছে। কার্ত্তিক মাসের শেষ ভাগেই তাঁহাদিগকে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে; কিন্তু স্থান কোথায়? অলকা যদিও নানাপ্রকার সান্ত্বনা দ্বারা পিতাকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তাই বলিয়া ত শিবচরণ বালক নহেন যে, আসন্ন বিপদ ভুলিয়া থাকিবেন। নিদারুণ মানসিক কষ্টে শিবচরণের হাঁপানির টান আরও বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সমস্ত দিন তিনি অধিকাংশ সময় শয্যাতলে মুখ লুকাইয়া পড়িয়া থাকেন। কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহেন না, দুই তিনবার না ডাকিলে উত্তর দেন না। পিতাকে একটু শান্তিতে রাখিবার জন্য যে অলকার এত প্রাণপাত যত্ন, সেই পিতার নিদারুণ মনঃকষ্টে অলকার হৃদয়ও বিদীর্ণপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন দুপুর বেলা রান্নাখাওয়া শেষ করিয়া অলকা যখন বারান্দায় বসিয়া সুপারী কাটিতেছিল, অহল্যা তখন পাড়া প্রদক্ষিণ করিয়া বাড়ীতে পা দিয়াই অলকাকে দেখিয়া সোৎসাহে কহিল, "শুনেছ অলি, আমাদের সুদখোর ঠাকুরের কি দুর্দ্দশা হয়েছে? কিপ্‌টে বামুন ঘরে তো আলো রাখ্‌বে না, অন্ধকারে বেরুতে গিয়ে চৌকাটের ওপর পড়ে তার হাতটা একেবারেই ভেঙ্গে গেছে। ঘরের মধ্যে শুয়ে, মাগো—মাগো কর্‌ছে। যেমন কেপ্পন, তেমনি হ'ল।" অলকা অহল্যার দিকে তাহার স্নেহময় নয়নদুইটি তুলিয়া মমতাপূর্ণ কণ্ঠে কহিল "আহা বড় ত কষ্ট হয়েছে? আজ তাঁর রান্না ক'রে দিলে কে মাসী?"

অহল্যা হাত নাড়িয়া মুখ ঘুরাইয়া কহিল, "রান্না আবার কে করবে? সাত জনার বালাই পড়েছে।" "তুমি একটু বাড়ীতেই থাক মাসী, বাবা ঘুমের মতন হয়ে আছেন, তাঁর কিছু দরকার টরকার হলে দিও। আমি এখনি

আস্‌ছি।" বলিয়া অলকা বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। তাহাদের বাড়ী হইতে মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী বেশী দূর নহে, তবুও পাড়ার একটি ছোট মেয়েকে সে সঙ্গে লইল। তথায় গিয়া অলকা ব্রাহ্মণের ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া কোমল কণ্ঠে ডাকিল—"জ্যাঠামশায়?"

সেই কণ্ঠস্বরে মুখোপাধ্যায় মহাশয় চমকিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। চাহিয়া দেখিলেন—স্নেহপ্রবণা গৃহলক্ষ্মীর মত অলকা তাহার দীপ্তিপূর্ণ নয়নদুইটি বিস্ফারিত করিয়া তাঁহারই দিকে চাহিয়া আছে।

অলকা তাড়াতাড়ি কতকগুলি গাছ-গাছড়া বাটিয়া ব্রাহ্মণের আহতস্থানে বাঁধিয়া দিল। ক্ষিপ্রহস্তে রাঁধিয়া বাড়িয়া ভাত আনিয়া ডাকিল, "জ্যাঠামশায়, আস্তে আস্তে উঠে দুটো খান, বেলা যে চলে গেল।" এ স্নেহের আহ্বানে তাঁহার চোখে জল আসিল। মনে হইল, এ জগতে তাঁহাকে ভালবাসিবার এবং তাঁহার ভালবাসা পাইবার কেহই যেন নাই। এক পুত্র, সেও পিতার স্নেহহীন ব্যবহারে প্রবাসগত। হৃদয় মরুভূমি হইয়া গিয়াছে, সেখানে এক বিন্দু শীতল জল নাই, একটি তৃণলতাও তথায় অঙ্কুরিত হয় নাই। আছে শুধু অর্থের পিপাসা—আর শান্তিহীন হৃদয়ের সুতীব্র যন্ত্রণা।

(৫)

হেমন্তের শিশিরমণ্ডিত প্রভাতের রৌদ্রে চৌকি পাতিয়া শিবচরণ বসিয়াছিলেন। তাঁহার সন্নিকটে বসিয়া অলকা কতকগুলি ছিন্নবস্ত্র রিপু করিতেছিল, এমন সময় চটিজুতার শব্দে পিতা পুত্রী দুই জনেই চাহিয়া দেখিলেন, মুখোপাধ্যায় মহাশয় আসিতেছেন। অলকা ব্যস্তসমস্ত হইয়া ঘর হইতে আসন আনিয়া ব্রাহ্মণকে বসিতে দিল। শিবচরণ শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন, "ভাল আছ দাদা? হাতের ব্যথাটা এখন—"

"হ্যাঁ, ভাল আছি। অনেক দিনের পর তোমাদের এ-পাড়ায় এসেছি ভায়া। তা—সাতুই অগ্রহায়ণ তোমায় কিন্তু এ বাড়ীটা ছেড়ে যেতেই হবে, সেই কথা বল্‌তেই এসেছি।" মুখোপাধ্যায়ের কথায় শিবচরণের রক্তহীন মুখখানি কাগজের মত সাদা হইয়া গেল। তিনি কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "আজ ২রা অগ্রহায়ণ, পাঁচ দিনের মধ্যে কোথায় যাব দাদা? তোমার কাছে ভিক্ষে চাচ্ছি, আর একটা সপ্তাহ, আমায় এ জীবনের মত এখানে থাক্‌তে দাও। তার পর"—

ব্রাহ্মণ বাধা দিয়া বলিলেন, "সাতুই তারিখের ওদিকে আমি কিছুতেই যেতে পার্‌ব না দাদা। তুমি আমার কাছে ভিক্ষে চাইছ, কিন্তু আমিও যে আজ তোমার কাছে ভিক্ষে চাইতে এসেছি ভাই। বল, দেবে; যা চাইব, তাতে 'না' করবে না?"

শিবচরণ ক্ষোভের হাসি হাসিয়া বলিলেন "আমার কাছে তুমি ভিক্ষে চাইতে এসেছ দাদা, উপহাস কেন? ভাগ্যবিপাকে আজ আমার এ দশা হয়েছে। তোমার কথা আমায় 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত' লাগ্‌ছে।"

"শিবচরণ, আমি তোমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে আসি নাই ভাই, আমি আজ তোমার কাছে প্রতিগ্রহ করতে এসেছি। বল তুমি,—আমার অলকা মাকে আমায় ভিক্ষে দেবে? আমি যাই হই না কেন, আমার ছেলে অপূর্ব্ব, আমার মায়ের অনুপযুক্ত হবে না।"

প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ উৎকণ্ঠিত দীন নয়নে শিবচরণের নির্ব্বাক্ মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া, চাদরের মধ্য হইতে কতকগুলি গহনা বাহির করিয়া, অদূরে উপবিষ্টা লজ্জানতমুখী অলকার সর্ব্বাঙ্গে এক একখানি করিয়া পরাইয়া দিলেন। গহনা পরান শেষ হইলে, শিবচরণের দিকে চাহিয়া অনুচ্চকণ্ঠে কহিলেন "সাতুই অগ্রহায়ণ গোধূলি-লগ্নে মাকে আমি নিয়ে যাব। সমস্ত আয়োজনই হয়ে গেছে, তুমি কাল একবার অপূর্ব্বকে আশীর্ব্বাদ ক'রে এস।" পরে একটু হাসিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন "আমার ঘর অন্ধকার ক'রে, তোমার ঘর আলোকিত করবার জন্য মাকে আর এখানে রাখ্‌তে পার্‌ব না ভাই। কাজেই তোমাকে এ বাড়ী ছেড়ে মার কাছে গিয়েই থাক্‌তে হবে। তা কিন্তু আগ থাক্‌তেই ব'লে রাখ্‌ছি।"

"একি মা? তুমি এমন হয়ে বসে রইলে কেন? এ বুড়ো ছেলের কাছে লজ্জা কি অলকা? উঠে গিয়ে তোমার বাবার পায়ের ধূলো মাথায় নাও মা।" অলকা কোন মতে সলজ্জ দেহ তুলিয়া ধীরে ধীরে মুখুজ্জে মহাশয়কে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল। তাহার পর পিতার পায়ের কাছে নত হইতেই তিনি দুই বাহু প্রসারিত করিয়া কন্যাকে বক্ষে ধরিয়া, অশ্রুপূর্ণ আনন্দকণ্ঠে কহিলেন "আজ আমার বড় আনন্দের দিন অলকা, আজ তোর মা কোথায়?"

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

পত্র ও চিত্র

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন

ইংরাজিতে আজকাল যাকে natural selection কহে, বাঙ্গালাভাষায় আমরা তাকেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছি। প্রকৃতির সর্ব্বত্র এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন খেলিতেছে। এই নিয়মের বলেই যার জন্য যেটির প্রয়োজন, সে সেইটি আপনা হইতে বাছিয়া লয়। জীবের মধ্যে, জীবস্থিতি রক্ষার জন্য, এই প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন যৌননির্ব্বাচন রূপে প্রকট হয়। আমাদের এই জাহাজের জীবজগতেও এই নির্ব্বাচন-বিধানটি স্বতঃই প্রকট হইতেছে। প্রথম দিন, তখনও বোম্বাই বন্দর ছাড়াইয়া আসি নাই, খাইতে যাইয়া দেখিলাম যে, কেউ কা'কে ডাকে নাই, অথচ শ্যাম ও কালোর দল, কেমন আপনা হইতেই একটা টেবিলে আসিয়া ভিড় করিয়া বসিলেন। সেদিন হইতে এই বর্ণ-ভেদ সমানে চলিয়া আসিয়াছে। শ্বেতের দলেও আবার একটা ভাগাভাগি দেখা যাইতে লাগিল। সেনানীদল এক হইয়া গেলেন, তাঁদের টেবিলে সিভিলিয়ানদের বড় দেখা যায় না। খাবার ঘরে যে নিয়ম, উপরের ডেকে, যেখানে যাত্রীরা সারাদিন চলাফেরা করে, সেখানেও সেই নিয়ম। শ্যামসুন্দরেরা নিজেদের মধ্যেই থাকেন,—নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা, নিজেদের সঙ্গে বেড়ান, নিজেদের দলে বসা—এইরূপ করেন। সাদার দলও তাই করেন। কেউ যে সংকল্প করিয়া এটা করে, তাহা নয়; কিন্তু কেমন আপনা হইতেই এটা হইয়া যায়। এই সকল জাহাজে আরও ত যাতায়াত করিয়াছি, আর সর্ব্বদাই এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের খেলা দেখিয়াছি।

এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের মধ্যেই আবার আর একটা নিয়মও আছে। আধুনিক জীববিজ্ঞান ইহাকে যৌন-নির্ব্বাচন কহে। এই যৌন-নির্ব্বাচন বা 'sex-selection'এর নিয়মটাও এই জাহাজে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। গুড়-ফোঁটা মাটিতে পড়িলেই মাছির ও পীপড়ার দল যেমন সেখানে যাইয়া জুটে, সেইরূপ একটু রূপের আভাস ও যৌবনের স্বপ্ন যেখানেই মিলিয়াছে, সেখানেই রসপিয়াসু রসিকের দল গিয়া ঝাঁকিয়া পড়িতেছে। এই জাহাজে কতকগুলি রূপসী ছিলেন বলিয়া, আমাদের প্রাণ বাঁচিয়া আছে। এঁরা না থাকিলে এই সমুদ্রের বুকেও ভীষণ সাহারা ফুটিয়া উঠিত। আর এঁরা আছেন বলিয়া, আমরা বড়ই

শান্তিতে আছি। এঁরা আছেন বলিয়া, আমরা পলিটিক্‌স্ লইয়া, বা ধর্ম্ম লইয়া, বা সমাজ-তত্ত্ব লইয়া, দিনরাত বাদবিতণ্ডা করিবার অবসর পাই না। যারা বাদবিতণ্ডা করে, তাদের এ সকল বিষয়ে রুচিও নাই, আর এ সকল কলহ-কোলাহল জাগাইবার অবসরও নাই। আমি ত এইজন্য, বাঁচিয়া গিয়াছি। না হইলে কি এমন শান্তিতে বসিয়া প্রতিদিন এতটা লেখাপড়া করিতে পাইতাম? আমাদের নিজেদের অর্থাৎ শ্যাম-জাতের মধ্যেই রাজনীতির হিসাবে—নরম-গরম, সরকারী-বেসরকারী, কত দল আছে। কিন্তু এঁদের অনেকেরই রাজনীতির আলোচনা করিবার আদৌ অবসর নাই। ঐ গুড়ের ছিটা-ফোঁটার চারিদিকে ইহারা ঘুরিতে ফিরিতেই দিন কাটাইয়া দেয়, অন্য খেলার প্রবৃত্তিও থাকে না, অবসরও থাকে না। প্রাচীন ইতিহাস বলে, রূপের লাগিয়া মানুষে মানুষে মারামারি কাটাকাটি হইত। জানকীকে লইয়া রামরাবণের যুদ্ধ। হেলেনাকে লইয়া ইলিয়দের লড়াই। কত আগুনই জ্বলিল, কত লোকই মরিল! আধুনিক সভ্যতা সে অবস্থা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে মানুষ বুঝিয়াছে, এতটা মারামারি কাটাকাটি করিয়া যে রূপের পসরা দখল করিতে হয়, ভাগ্যে তার ভোগ হয় না। সে বোঝা বহিতেই প্রাণ যায়। তবে ঠিক হাতাহাতি না করিয়াও, আইন-আদালতের সাহায্যে এখন মাঝে মাঝে লোকে রূপের দখল করে বটে। এই জাহাজেই ইহার দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু পরকীয়া অবস্থায় যে-রস মিলিয়াছিল, ডাইর্ভোস আইনের কৃপায় তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া, যখন বস্তুটি স্বকীয়া হইয়া পড়িল, তখন তাহার জ্বালায় দু'দিনে সোনার বরণ কাল, আর কাল কেশ সাদা হইয়া গেল। বেচারীকে দেখিলে দুঃখ হয়। পরের বাগানে যেটা মিষ্টি আম ছিল, পাপের ফলে, নিজের ঘরে আসিয়া তাহা কি না একেবারেই মাকাল হইয়া গিয়াছে! এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ের পূর্ব্বেও এই বেচারিকে দেখিয়াছি, তখন তাহার এক চেহারা ছিল। আর আজ? এ কি হইয়াছে? এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই সভ্যজগতে এখন কেউ আর রূপের লাগিয়া বড় একটা কাটাকাটি মারামারি করে না। আর কেনই বা করিবে? রূপের যাচাই করা যে আজকাল বড়ই কঠিন। এই জাহাজে কত রূপ ফুল ফুটিয়া থাকে। কিন্তু হাসনা-হানার বা lady of the night নামে বিদেশী ফুলের মতন, এঁরা সন্ধ্যাসমাগমে কেমন অদ্ভুতরূপে ফুটিয়া উঠে ও চারিদিকে কত সুগন্ধ ছড়ায়; কিন্তু প্রভাতের আলোক-সংস্পর্শে সে সব বরণ-কিরণ-গন্ধ কোথায় লুকাইয়া যায়, তার কল্পনার

লেশও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রাচীন কালে পুরুষের বীর্য্য ও রমণীর রূপ দুই' সাচ্চা, সজীব ছিল। আধুনিক সভ্যতায় দুই' গিল্টি, কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। কত সভ্যপুরুষ দেখিয়াছি—সাম্‌নের দিক্ দিয়া চাহিলে, যাদের শরীর কেমন সতেজ, গঠন কেমন সরল ও বলিষ্ঠ দেখায়। কিন্তু পেছনের দিকে একটু ভাল করিয়া দেখিলেই তিমি মাছের হাড়ের ঠেকা দিয়া, কুব্জপৃষ্ঠ ও চড়ুইবক্ষ কেমন করিয়া সোজা ও চৌড়া করিয়া দেখান হইয়াছে, তার নিগূঢ় সংকেতটি বাহির হইয়া পড়ে। আর রমণীরূপ? সভ্যতার রমণীরূপ কতটা যে বিধাতার দান, আর কতটা যে বাজারের কেনা, তার ঠিকানা করা বড়ই কঠিন। কেমন ফুট্‌ফুটে, দুধে-আলতা মাখান রং। সন্ধ্যার আলোকে, তড়িতদীপের নীচে, কি বাহারই না ফুটিয়া উঠে। মনে হয় কত শক্তি, কত স্বাস্থ্য না জানি এই রূপের আড়ালে লুকাইয়া আছে। কিন্তু প্রভাতে যখন স্নানাগারের কক্ষে রূপসীর সঙ্গে চকোচকি হয়, তখন দেখি—সবই ডাক্তার-খানার শিশির কারচুপি। সে রং তখন ধুইয়া গিয়াছে। চোকের চারিধারে সে কোমল চিক্কণতা আর নাই—কাক-পদচিহ্ন সকল ভিড় করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল কি বর্ণের? দন্তরুচিকৌমুদী হাসিতে হাসিতে কতই না ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু এই মুকুতাশ্রেণীর মতন দাঁতগুলি কার? এই সন্দেহটা কিছুতেই মনের ভিতরে চাপাইয়া রাখা যায় না। আর চরণচুম্বিত কৃষ্ণ বা স্বর্ণ কেশকলাপ—তার কথা না তুলাই ভাল। গেলবারে যখন বিলাত যাইতেছিলাম, একটি রমণীর অদ্ভুত কেশভার দেখিয়া বিস্ময়ে মন ভরিয়া যাইত। "জনমিয়া দেখি নাই—হেন"—কেশরাশি। কিন্তু এই সুয়েজের বন্দরে যখন জাহাজ আসিয়া লাগিল, আর ডাক্তার আসিয়া ভোর বেলা যাত্রীদের পরীক্ষা করিতে গেলেন, তখন সকলকেই একস্থানে সার দিয়া আসিয়া দাঁড়াইতে হইল। তখন দেখিলাম, ঐ মাথায় সে বোঝা আর নাই, তার স্থানে কতকগুলি নিঃসঙ্গ বিরল কেশগুচ্ছ, কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া সভ্যতার রমণীরূপের উপরে কেহ আর নির্ভর করিতে সাহস পায় না।

আমি যে বারে প্রথম বিলাত যাই—সে আজ প্রায় কুড়ি-একুশ বৎসরের কথা,—বিলাতের হাইকোর্টে একটা মামলা উঠিয়াছিল। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর নামে প্রতারণার অভিযোগ আনিয়া বিবাহ-ভঙ্গ হইবার আদেশ প্রার্থনা করিয়াছিল। তার নালিশ এই ছিল যে, যখন এই রূপসীকে সে বিবাহ করিতে

রাজি হয়, তখন তার ধারণা ছিল যে, তার দুটি উজ্জ্বল নীলাভ চক্ষু আছে। বিবাহের পরে সে জানিয়াছে যে, এই রমণীর একটি চক্ষু নাই। কৃত্রিম স্ফটিক-চক্ষু পরিয়া সে নিজেকে চক্ষুষ্মতী বলিয়া দেখাইয়া, তাহার ভবিষ্য-স্বামীকে প্রতারণা করিয়াছে। তার একটি চক্ষু নাই জানিলে বাদী তাহাকে কখনই বিবাহ করিতে যাইত না। বিচারপতি রায় দিলেন যে, এই অজুহাতে আধুনিক সভ্যতায় বিবাহ-ভঙ্গ হইতে পারে না। কারণ, কাহারও কৃত্রিম চক্ষুর জন্য যদি বিবাহ-ভঙ্গ করিতে দেওয়া হয়, তবে কৃত্রিম দাঁতের জন্য, বা পরচুলার জন্য, বা কৃত্রিম রংয়ের জন্য, বা কৃত্রিম দেহগঠনের জন্য কেন যে বিবাহ-ভঙ্গ হইবে না, ইহার কোনও হেতু দর্শান অসম্ভব হইবে। আর এ সকল কারণে বিবাহ-ভঙ্গ হইলে, সমাজ কোথায় যাইয়া দাঁড়াইবে?—"Where shall we stand?"—বিচারপতি এই প্রশ্ন করিয়াই মাম্‌লা ডিসমিস্ করিয়া দেন।

সভ্যতার রূপের বাজারের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন এই মেকি রূপের লাগিয়া কে আর মারামারি কাটাকাটি করিতে যাইবে? এ-রূপ দূর হইতে দেখিতেই ভাল। তাই রূপপিয়াসু রসিকের দলও এখন শিয়ানা হইয়াছে—দূর হইতেই তাহারা রূপ দেখিয়া, চাকিয়া বেড়ায়। রূপের চারিপাশে ঘুরিয়া-ফিরিয়া, "ধরি মাছ, না ছুঁই পানি"—নীতি অবলম্বনে ফষ্টিনষ্টি করিয়া জীবনের নিরর্থক অবসর-কাল কাটায়। বেশী ঘেষাঘেষি, মিশামিশি, হৃদয়-গলাগলি, প্রাণঢালাঢালি করে না। আধুনিক সভ্যতার রূপের হাটে, যৌন-লীলা-বৃন্দাবনে, ইহাকেই ফ্লার্টেষণ কহে। এই জাহাজে এই ফ্লার্টেষণ-লীলা প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত অবিরাম চলিতেছে। দেখিয়া দেখিয়া বিরক্তি জন্মিয়া যাইতেছে।

সত্যের একটা মর্য্যাদা আছে। সে সত্য সমাজ-নীতির ভিতরেই থাকুক, আর তাহার বহির্ভূতই হউক, তার মর্য্যাদা নষ্ট হয় না।

"জীবন্তে মরিয়া যে, আপনা খোয়াইয়াছে"—

তার সমাজ-দ্রোহিতার মধ্যেও একটা মহত্ত্ব, একটা মনুষ্যত্ব লুকাইয়া থাকে। বিল্বমঙ্গল তার প্রমাণ। এ বস্তু দেখিলে সুখ হয়, আরাম হয়, শুষ্ক-প্রাণ মুঞ্জরিয়া উঠে। এই বস্তু দেখিয়াই বুড়া মার্কিণ কবি এমার্সন কহিয়াছিলেন—

I thank ye, oh young excellent lovers ye keep the world young for me—

অর্থাৎ হে যুবক-প্রেমিকেরা, তোমাদের আমি ধন্যবাদ দেই, তোমরা এই সংসারে আমার নিকটে এই বৃদ্ধ বয়সেও যৌবনের আলো ফুটাইয়া রাখিয়াছ। এরূপ কিশোর-কিশোরী একটিও যদি এই জাহাজে দেখিতে পাইতাম, সত্যই ধন্য হইয়া যাইতাম। কিন্তু এ কৃত্রিম, এ হীন ও হেয় কামাচার ও কামলিপ্সা দেখিয়া দেখিয়া জ্বালাতন হইয়া চলিয়াছি। এ সকল এতই চক্ষে লাগে যে, এখন আর, এক আহারের বেলা ছাড়া, অন্য সময়ে জাহাজের যাত্রীদলের জনতার ভিতরে যাই না।

এই প্রভাতের আলোকে আমরা সুয়েজ-খালের মোহানায় আসিয়া লঙ্গর করিয়াছি। এখানে মিশর-সরকারের ডাক্তার আসিয়া যাত্রী ও জাহাজের কর্ম্মচারীদের পরীক্ষা করেন; কোনও সংক্রামক রোগ জাহাজে আছে কি না, ইহা দেখিয়া,—না থাকিলে, একখানা ছাড়-পত্র দেন। এই ছাড়-পত্র পাইলে জাহাজ অবাধে যে-কোন বন্দরে গিয়া লাগিতে পারে ও যাত্রীরা সেখানে নামিতে পারেন। এখনই ডাক্তার আসিবেন। আমাদিগকে এইজন্য হলঘরে (saloon'এ) যাইয়া জুটিতে হইবে। এইজন্য এই চিঠি এইখানেই শেষ করিতে হইল।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

ভূমধ্যসাগর—মার্শেলের পথে। ১৯শে আগষ্ট, ১৯১৯।

ঈশ্বর-ইচ্ছা হইলে, কাল প্রাতে আমরা মার্শেল পৌঁছিব। ১৮।১৯ দিন পরে মাটির পরশ পাইবার জন্য প্রাণটা ব্যাকুল হইয়া আছে। এই ক'দিন এই নিরবচ্ছিন্ন নীলাম্বুরাশির উপরে ভাসিয়া ভাসিয়া হায়রাণ হইয়া উঠিয়াছি। এই জাহাজে কাজের মধ্যে ত দুই—খাই আর শুই। মাঝে মাঝে একটু আধটু লেখাপড়া করিতে চেষ্টা করিয়াছি বটে, কিন্তু তাতে জাহাজের বিরাট অকর্ম্মের অবসাদ একটুও ঘুচে নাই।

যাদের বয়স আছে, আর সঙ্গী ও সঙ্গিনী তেমন জুটিয়া যায়, তারা মদখেয়ে, জুয়াখেলে, ফ্লার্টেষণ করে, কোনওরূপে দিনটা কাটাইয়া দেয়। আমার মতন লোকের পক্ষে তা'ত আর সম্ভব নয়। কাজেই অধিকাংশ সময়ই কেবল শুইয়া কাটাইতেছি। এই সকল জাহাজে কি যে জুয়াখেলার ধুম পড়িয়া যায়, তা কহতব্য নয়। আজ শুনিলাম, একটা লোক নাকি এই ক'দিনে তাস খেলিয়া পঞ্চাশ পাউণ্ড বা ছ'শ টাকা জিতিয়াছে। শুনিলে

গায়ে কাঁটা দেয়। আর কাদের সঙ্গে খেলে? নিজের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে। এরা ভদ্রলোক, সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও রমণী। সব চাইতে দুঃখের কথা—এব্যক্তি বিদেশী নয়, আমাদের স্বদেশী! হায় রে সভ্যতা!

চাট্‌নি

তবে এই জাহাজের অলস জীবনের অবসাদের মধ্যে যে একটু আধটু উত্তেজনার সৃষ্টি হয় না, তাহা নয়। সাদায় কালোয় যতই চেষ্টা করা যাউক না কেন, কিছুতেই ভাল করিয়া মিশে না। এই জাহাজে ত স্যার শঙ্করণ হইতে আরম্ভ করিয়া দু'চার জন খুব প্রসিদ্ধ ভারতবাসী যাচ্ছেন। দুজন দেশী সিভিলিয়ান পর্য্যন্ত আছেন। কিন্তু এঁরা পর্য্যন্ত কেমন আলাহিদা হইয়া থাকেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমরা কালোর জাত, সকলে একটা টেবিলে খাই। কেবল মান্যবর বিচারপতি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মল্লিক মহাশয় অন্য টেবিলে খান। মল্লিক-মহাশয়ের গৃহিণী বিদেশিনী। বোধ হয়, সেই জন্যই তাঁর এই কালোদের টেবিলে পোষায় না। এঁরা প্রায়ই দিন রাত দুটি চকাচকির মতন নিভৃতে বসিয়া কাটান। মান্দ্রাজের গবর্ণরের খাস মজলিসের অমাত্য শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারিয়ারও সস্ত্রীক বিলাত চলিয়াছেন। আচারিয়ার মহাশয়, মালাবারের প্রথা-অনুসারে, নিজে ব্রাহ্মণ হইয়াও নায়র-মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। এঁরাও দুটিতে কপোত-কপোতীর মতন সর্ব্বদা যেন জোড় বাঁধিয়া থাকেন। আমার অনেক সময় মনে হইয়াছে, বৃদ্ধ ও সুরসিক রাজপুরুষ বুঝি সম্প্রতি পাণিগ্রহণ করিয়া, ইংরাজের প্রথা অনুসারে "হনিমুনে" চলিয়াছেন। এঁদের দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। আর ভবভূতি মনে পড়ে—

"ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে।"

এসকল জাহাজের জীবনে রস আনিয়া দেয়। কিন্তু মধুর রস ছাড়াও মাঝে মাঝে অন্য রসের অভিনয় হইয়া থাকে। সেদিন স্নানের জায়গায় এরূপ একটু রসোদ্গারের আয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল আর কি। ভাগ্যে রসটা জমিতে না জমিতে ভাঙ্গিয়া গেল। ঘটনাটি এই;—

প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্নানের জায়গায় স্নানার্থী যাত্রীদের বেশ ভিড় হয়। আজ আমাকে সেখানে যাইয়া প্রায় পোনর মিনিট দাঁড়াইয়া হাওয়া খাইতে হইয়াছিল। অনেকের ভাগ্যে প্রায় প্রতিদিনই এরূপ ঘটে! যাঁরা খুব ভোরে অর্থাৎ ৭টার মধ্যে স্নানক্রিয়া শেষ করিতে না পারেন, তাঁদের

অনেকক্ষণ উমেদারী করিতে হয়। তবে ভাগ্যের কথা এই যে, সভ্যতার স্নানটা, বিশেষতঃ ইউরোপে, নিত্যকর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয় না। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন প্রথম বিলাতে যাই, তখন লণ্ডন সহরের অর্দ্ধেক বাড়ীতে পূর্ণস্নানের কোনও ব্যবস্থা ছিল না;—কাক-স্নানের একটা ব্যবস্থা মাত্র করিয়া লওয়া সম্ভব ছিল। এখন অনেকটা বদলিয়া গিয়াছে। তথাপি প্রতিদিন অবগাহন স্নানটা যে আবশ্যক, সকল সভ্যলোকে এমন মনে করেন না। মাথা, মুখ ও হাত ধুইলেই হইল। এই জাহাজের সাদাজাতের যাত্রীদের সকলে স্নান করেন কি না সন্দেহ। অন্ততঃ অনেকেই আহারের পূর্ব্বে, আমাদের মতন স্নানাদি নিত্যক্রিয়া শেষ করিবার জন্য কিছুমাত্র ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন না। তবে যাঁরা বহুকাল আমাদের দেশে বাস করিতেছেন, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। এঁরাই কেবল প্রাতঃস্নানের জন্য স্নানের জায়গায় আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন।

সেদিন আমরা তখন লোহিত-সাগরের বুকে ভাসিয়া চলিয়াছি, সুয়েজ ধরি-ধরি এমন হইয়াছে,—একটি সম্ভ্রান্ত, বয়স্ক, হিন্দু ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে একজন সাদা-যাত্রী তাঁর স্নানের কামরার দরজায় ঘা দিতে ও ঠেলাঠেলি করিতে আরম্ভ করিল। আমাদের বন্ধুটির স্নান তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু এই বেয়াদবি দেখিয়া তিনি আরও দু'দশ ঘটি জল ঢালিতে লাগিলেন। স্নানান্তে যখন তিনি বাহির হইয়া আসিলেন, তখন সাদা "ভদ্রলোকটি" তাঁর কাছে যাইয়া, তীব্রস্বরে বলিলেন; "What business had you to be here for so long?" অন্য লোকের সঙ্গে হইলে তখনি হাতাহাতি হইয়া একটা বীর বা বীভৎস রসের অভিনয় হইয়া যাইত। কোনও কোনও ভারতবাসী যুবক যাত্রী অমন কথা কহিয়াছেন। কিন্তু এই ধীরবুদ্ধি ব্রাহ্মণ সে ক্ষত্রবীর্য্যের পরিচয় দিলেন না। তিনি ইহার উত্তরে কহিলেন:—It is easy to be polite for those who are brought up that way. If you had not this in your upbringing, you might remember at least that we have long left Aden behind. অর্থাৎ ভদ্রঘরে যে জন্মেছে, সৌজন্য তাহার পক্ষে সহজই হয়। তোমার যদি এ শিক্ষা না হইয়া থাকে, অন্ততঃ এটা তোমার মনে করা ভাল যে, আমরা এডেন অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি। ইহার পরে আর সে ব্যক্তির মুখে কথা সরিল না।

সুয়েজের ও মিশরের কথা

সুয়েজে পৌঁছিয়া আমরা একটু বিপদে পড়িয়াছিলাম। প্রাতঃকালে আমাদের জাহাজ সুয়েজখালের মুখে আসিয়া লঙ্গর করিল। কিন্তু সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখি, একখানা জাহাজ খালের মুখে ডুবিয়া আছে। শুনিলাম, এইখানি ইতালীয় রণপোত। পূর্ব্বরাত্রে বয়লার ফাটিয়া শতাধিক লোক মরিয়াছে, আর জাহাজখানিও ফুটো হইয়া জলমগ্ন হইয়াছে। কি করিয়া যে এই দুর্ঘটনা ঘটিল, কেহ কিছু জানে না। কেউ কেউ অনুমান করিতে লাগিলেন যে, যুদ্ধের সময় শত্রুপোত ধ্বংস করিবার জন্য সমুদ্রগর্ভে যে সকল বোমার জাল ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তারই বোধ হয় দু'একটা স্রোতের টানে খালের মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল, আর তাহা ফাটিয়া গিয়াই এই দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছে। কর্তৃপক্ষীয়েরাও, শোনা গেল, এই সন্দেহের কোনও কারণ আছে কি না, তাহার বিশেষ অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই জন্য ডুবারী ডাকিয়া খালের মুখের তলদেশ তন্ন তন্ন করিয়া তাল্লাস করা হইতেছে।—আর কোনও বোমা সেখানে পড়িয়া নাই—ইহা যতক্ষণ না স্থির নির্দ্ধারিত হইয়া যাইবে, ততক্ষণ আমাদের জাহাজ খালে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইবে না। তারপর, ঐ ডোবা জাহাজখানিতেও যুদ্ধের সরঞ্জাম বোঝাই ছিল। তাহা হইতেও কোনও বিস্ফোরক গোলা বা বোমা বাহির হইয়া খালের ভিতরে পড়িয়াছে কি না, ইহাও দেখিতে হইবে। আর ইহা ছাড়া, ডোবা জাহাজখানিও না সরাইলে, অন্য জাহাজের পথ খোলসা হইবে না। অবস্থাটা যেরূপ বোঝা গেল, তাহাতে কদিন যে সুয়েজ খালের মুখে আটকা পড়িয়া থাকিতে হয়, তাহা জানা যায় নাই। জাহাজের কাপ্তান বলিলেন, চারি ঘণ্টায়ও পথ পরিষ্কার হইতে পারে,—পোনর দিনও বা লাগিতে পারে, কিছুই বলা যায় না।

এই অবস্থায় কেহ কেহ সুয়েজ হইতে রেলপথে মিসরের অন্যতম প্রধান নগরী কায়রো যাইয়া পোর্টসৈয়দে আসিয়া জাহাজ ধরিবার কল্পনা করিলেন। আমিও তাই করিব ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু সুয়েজে ওঠাই অসম্ভব হইল। কিছু দিন হইতে মিসর দেশে জঙ্গীশাসন বা মিলেটারি মার্শিয়েল ল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের পঞ্জাবের যে দশা হইয়াছিল, সমগ্র মিশরের আজ সেই দশা। মিশরে এখন বিদেশীয় লোকের প্রবেশ

নিষেধ। প্রয়োজন হইলে, সেনাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট হইতে ছাড়পত্র লইয়া যাইতে হয়। সুতরাং আমাদের মিসর দেখার সাধ দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় মনে উঠিয়া মনেই লয় পাইল।

পোর্টসৈয়দ বা পোর্ট সে'ড

যাহা হউক, সুয়েজ খালের মুখে আমাদের যতটা দেরি হইবার আশঙ্কা ছিল, ততটা দেরি হয় নাই। মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিলাম, জাহাজ চলিতেছে—খালের ভিতর দিয়া মন্থরগতিতে চলিয়াছে। সেদিন নয় দশটা রাত্রিতেই জ্যোৎস্না ফুটিয়াছিল। আর জ্যোৎস্নালোকে খালের বুকের বালুকা-রাশি বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। সুয়েজখালটা খুব চৌড়া নহে। সকল স্থানে এক সঙ্গে দুখানা জাহাজ চলিতে পারে না। এই জন্য মাঝে মাঝে এক একটা ফার্দা জায়গা আছে। উজান ও ভাঁটির জাহাজ ঐ সকল ফার্দা জায়গায় আসিয়া একে অন্যকে ছাড়াইয়া যায়। রেলে যেমন নিশান বা আলো দেখাইয়া লাইন খোলা বা বন্ধ জানান হয়, এখানেও সেইরূপ ব্যবহার আছে। খালে অন্য জাহাজ নাই, এটা না জানিলে কোনও জাহাজ এসকল ফার্দা জায়গা ছাড়িয়া সরু খালে প্রবেশ করে না। সুয়েজখালের দুধারে এখনও লড়াইয়ের সময়ের স্মৃতিচিহ্ন সকল পড়িয়া আছে।

বেলা দুইটার সময় আমরা পোর্টসৈয়দে পৌঁছিয়াছি। এখানেও জঙ্গী-আইন চলিত। কিন্তু বন্দর দেখার কোনও বিশেষ ব্যাঘাত বা বাধা নাই। তাই আমরা আমাদের পাশপোর্ট পকেটে লইয়া পোর্ট সৈয়দে নামিয়া পড়িলাম। সমুদ্র-তীর হইতে, পূর্ব্বে যেখানে সেখানে, যাইয়া নৌকা হইতে উঠিতে পারা যাইত। এবারে সে স্বাধীনতা মিলিল না। নির্দ্দিষ্ট ঘাটে যাইয়া নামিতে হইল। সেই ঘাট হইতে সেনা-রক্ষিত তোরণ পার হইয়া সহরে ঢুকিতে হইল। এই তোরণমুখে আমাদের পাশপোর্ট দেখাইতে হইল। একটি আরব্যদেশীয় লোক আমার আগে আগে যাইতেছিল। দরজায় দেখিলাম, একজন পাহারা-ওয়ালা তার সর্ব্বাঙ্গ চাপিয়া টিপিয়া দেখিয়া, কাপড়ের ভিতর কিছু আছে কি না, পরীক্ষা করিয়া তবে তাহাকে যাইতে দিল। আমি ভাবিলাম, বুঝিবা আমাদেরও ঐরূপ টিপিয়া চাপিয়া দেখিবে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহা করিল না। আমরা বিনাআপত্তিতে সহরে ঢুকিলাম।

দশবৎসর পূর্ব্বে একবার এই পোর্ট সৈয়দে নামিয়াছিলাম। কিন্তু তখনকার

সে সহরে আর এখনকার সহরে আকাশ জমিন প্রভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তখন সহরটা অতিশয় কদর্য্য, অত্যন্ত নোংরা ছিল। বাড়ী, দোকান সবই কদর্য্য দেখাইত। এই দশ-বৎসরে সে সব বদলাইয়া গিয়াছে। আগে সহরটা অতি ছোট ছিল—একটা কি দুইটা বড় রাস্তার উপরেই যা কিছু ঘরবাড়ী ও দোকানপাট ছিল। এখন সেই সহর দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এক ভাগকে ফরাসী সহর বা French town ও অপরটিকে দেশী সহর বা Native town কহে। ফরাসী সহর সমুদ্রের তীরে—অতি পরিষ্কার, অতি পরিপাটি, ধন ও বিলাসের লীলাভূমি হইয়া আছে। ইহার পশ্চাতে দেশী সহর—দারিদ্র্যের আবাস, অপরিপাটি ও অপরিষ্কার। দুনিয়ার সর্ব্বত্রই আজ এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। ইহার প্রতিবিধানের উপায় এখনও আধুনিক সভ্যতা খুঁজিয়া পায় নাই।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

রহিম সর্দ্দার

(১)

গায়ের চাদরখানা কোমরে জড়াইয়া, সুদীর্ঘ তৈলপক্ক বাঁশের লাঠিটা কাঁধের উপর রাখিয়া, রাজীবপুরের রায়বাবুদের প্রধান পাইক রহিম সর্দ্দার নদীর পথ ধরিয়া চলিতেছিল। তখন অপরাহ্ণের সূর্য্য তরঙ্গমালিনী নদীর বুকে সোনার ধারা ঢালিয়া দিয়া, পশ্চিম পাড়ের দীর্ঘ বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে আত্মগোপন করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। দূরে দূরে শাদা পাল তুলিয়া নৌকা ছুটিতেছিল।

বসন্তের মধুর অপরাহ্ণে প্রকৃতি আনন্দে হাসিতেছিল। সর্দ্দারের হৃদয়েও সে আনন্দের প্রস্রবণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে গলা ছাড়িয়া গান ধরিল,—

"তোমার কোন্ গেরামের নাও,
বঁধু, কোন্ গেরামের নাও,—"

নদীর পথ জনশূন্য। সেখানে কেহ তাহার গ্রাম্যকণ্ঠের তাললয়হীন সঙ্গীতের শ্রোতা ছিল না। সুতরাং সে যথেচ্ছ গাহিয়া চলিল,—

"একটা কথা কও বা না কও,
পান খায়ে যাও!"

নদীগর্ভস্থিত কোনও নৌকার অন্তরালে তাহার উদ্দিষ্ট কোনও বঁধু উৎকর্ণ হইয়া তাহার প্রাণভরা আকুল আহ্বান শুনিতেছিল কি না, অথবা পান খাইয়া যাইবার জন্য যে ব্যাকুল নিবেদন বিশাল-বক্ষ সর্দ্দারের হৃদয়ের অন্তঃপুর হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া ফাল্গুনের স্নিগ্ধ-পবনে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার শ্রোতা কোথাও অপেক্ষা করিতেছিল কি না, তাহার ইতিহাস জানা নাই।

রহিম সর্দ্দার আপন মনে গাহিতে গাহিতে নির্জ্জন নদীপথ ছাড়াইয়া ক্রমে গ্রামের পথে পড়িল। অদূরে মুকুন্দপুরের জমীদার বাবুদের প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখা যাইতেছে। রহিম আপনার বেশভূষা গোছগাছ করিয়া লইল। কোমর হইতে চাদরখানা খুলিয়া দেহ আবৃত করিল। বাব্‌রীকাটা দীর্ঘ, ভ্রমর-কৃষ্ণ, তৈলচর্চ্চিত কেশগুচ্ছ অসংযত হইয়া পড়িয়াছে কি না, বামহস্ত দ্বারা তাহা একবার পরীক্ষা করিল। তারপর ভদ্রলোকের মত পথ চলিতে লাগিল। লাঠিবাজি তাহার উপজীবিকা হইলেও সে একজন বড় জমীদারের সর্দ্দার-পাইক। সুতরাং অন্য জমীদারের দেউড়ীর পাশ দিয়া যাইবার সময় শিষ্ট-শান্ত, সভ্যভব্য হইয়া চলা উচিত, ইহা সে ভালরূপেই অবগত ছিল।

বাবুদের ফটক ছাড়াইয়া সে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় মুকুন্দপুরের জমীদারবাবুদের সর্দ্দার-পাইক রামলোচন দৌড়িয়া তাহার কাছে আসিল।

"ওস্তাদজি, একটু দাঁড়াও, কথা আছে।"

রহিম একটু বিস্মিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

রামলোচন হাসিমুখে বলিল, "সর্দ্দার, বাবু একবার তোমাকে ডাকুছেন। বড় জরুরী কাজ আছে, ওস্তাদ।"

রহিমের সমবয়স্ক হইলেও, রামলোচন এই দেশবিশ্রুত, ভীমপরাক্রম লাঠিয়ালের কাছে দীর্ঘকাল সাকরেদী করিয়াছিল। তাহার যাহা কিছু শিক্ষা, এই রহিম সর্দ্দারের কাছে।

শিষ্যের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া, কৌতূহলের বশীভূত হইয়া রহিম মুকুন্দপুরের জমীদারবাবুর সহিত দেখা করিতে চলিল। ইতিপূর্ব্বে সে কয়েকবার বাবুদের দাঙ্গাহাঙ্গামার ব্যাপারে সাহায্যও করিয়াছিল। অবশ্য সে সকল ব্যাপারে তাহার মনিবের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কোনও সংস্রব ছিল না।

রহিম সর্দ্দার তাহার বিশাল, ঋজুবপু ঈষৎ অবনত করিয়া জমীদার বাবুকে অভিবাদন করিল। তিনি প্রসন্ন-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সর্দ্দার, তোমাকে পাইয়া বড় ভাল হইল। শিবরামপুরের চরটা কালই দখল করিতে হইবে। নকিপুরের চৌধুরীদের সঙ্গে এই বিষয় লইয়া একটা দাঙ্গা হইবার সম্ভাবনা। তুমি বাপু যদি কাজটা হাঁসিল ক'রে দিতে পার, নগদ পঞ্চাশ টাকা আর একজোড়া শাল বক্‌শীষ পাবে। এ কাজ তোমায় ক'রে দিতেই হবে, সর্দ্দার।"

রহিম বলিল, "কর্ত্তা, আমি যে জরুরী কাজে যাচ্ছি, মনিব যদি রাগ করেন!"

জমীদার হাসিয়া বলিলেন, "তিনি রাগ করবেন না। আমায় তিনি ছোট ভাইয়ের মত ভালবাসেন। আমি তাঁকে পত্র লিখে দেব যে, তোমার সাহায্য আমার বিশেষ দরকার হয়েছিল। কাল দুপুরবেলার মধ্যে তোমার কাজ শেষ হয়ে যাবে, তার পর মনিবের কাজে গেলে চল্‌বে না কি?"

তা' চলিতে পারে। বিষ্ণুপুরের কাছারীতে সন্ধ্যালাগাৎ পঁহুছিয়া পত্র দিবার কথা। শিবরামপুরের চর হইতে বিষ্ণুপুর বিশ মাইল দূরবর্ত্তী। লাঠির সাহায্যে দশক্রোশ পথ সে হাসিতে হাসিতে দুই ঘণ্টায় অতিক্রম করিতে পারে। একবার খোলা মাঠের মধ্যে পড়িলে আর ভাবনা নাই। কিন্তু কথা হইতেছে, মনিব যদি অপ্রসন্ন হন। থামকা একটা হাঙ্গামার মধ্যে পড়িয়া সে আপনাকে বিপন্ন করে, তাহার স্নেহপ্রবণ প্রভু ইহা চাহেন না। চরদখল করা ব্যাপারটাকে সে আদৌ গ্রাহ্য করে না। খানকয়েক লাঠি তাহার পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিলে সে একাই দুইশত বড় বড় জোয়ানকে আধঘণ্টার মধ্যে 'পগার পারে' রাখিয়া আসিতে পারে। তাহার লাঠির প্রতাপের কথা বিশক্রোশের মধ্যে কে না জানে?

পুরস্কারের লোভ তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে লাগিল। আবার মনিবের অপ্রসন্নতার কথাও থাকিয়া থাকিয়া মনে বাধা জন্মাইতে লাগিল। অবশেষে সে স্থির করিল, মনিব আসল সংবাদ পাইবার পূর্ব্বেই সে তাহার কাজ সারিয়া তাঁহার কাছে পহুছিবে। পঞ্চাশটা টাকা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রোজগার করা বড় সামান্য কথা নয়! তাহার উপর আবার একজোড়া শাল!

রহিম সংকল্প স্থির করিয়া বলিল, "যে আজ্ঞে কর্ত্তা, তবে তাই হোক্।"

জমীদার বাবুর ইঙ্গিতে খাজাঞ্চি তোষাখানা হইতে টাকা আনিয়া দিল।

জমীদার বলিলেন, "এই নাও সর্দ্দার, আগাম পঁচিশ দিলাম। চর দখলের পর বাকি পাইবে। আর আমার তরফের দুইশত পাইক তোমার জিম্মায় রহিল। কিন্তু চর দখল করা চাই।"

রহিম গোঁফে চাড়া দিয়া বলিল, "সে জন্য ভাবনা নেই, হুজুর। রহিম সেখ আজ পর্য্যন্ত কোন কাজে হারে নি। দু'শ পাকের দরকার ছিল না। জনকুড়িক লোক হলেই এ গোলাম কাম ফতে কর্ত্তে পারে। আচ্ছা, যখন সঙ্গে দিচ্ছেন, তখন থাক।"

আভূমি নত হইয়া রহিম সর্দ্দার সেলাম বাজাইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

(২)

তখনও উষার আলোক ভাল করিয়া আকাশে উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। দুই বিরুদ্ধ পক্ষের চারি পাঁচ শত লাঠিয়াল শিবরামপুরের চরের উপর সমবেত হইতে লাগিল। ভিন্নপক্ষের লাঠিয়ালগণ তখন চর দখল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রহিম সর্দ্দার সদলবলে সেখানে পহুছিয়া একবার চারিদিকে চাহিল। দেখিল, অপর পক্ষের লাঠিয়ালগণের অধিকাংশই তাহার সাক্‌রেদ। শুধু সে পক্ষের সর্দ্দার, তাহার চিরপ্রতিযোগী কালীচরণ। ইতিপূর্ব্বে বহুবারই কালীসর্দ্দারের সঙ্গে তাহার বল-পরীক্ষা হইয়া গিয়াছিল। প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল হইলেও রহিমের সঙ্গে পাল্লা দিয়া কোন দিনই সে জয়লাভ করিতে পারে নাই। সে জন্য রহিম সর্দ্দারের উপর কালীচরণের ভীষণ আক্রোশ ছিল।

মুকুন্দপুরের নায়েবের শিক্ষামত রহিম, বিরুদ্ধপক্ষকে চর ছাড়িয়া যাইতে আদেশ করিল; বলিল—কথা না শুনিলে সে বলপূর্ব্বক উহা দখল করিবে। কালীসর্দ্দার বিদ্রূপভরে তাহাকে টিট্‌কারী দিল।

রহিম তখন ব্যূহরচনা করিয়া দলের পুরোবর্ত্তী থাকিয়া বিপক্ষদলকে আক্রমণ করিল। দশ মিনিট সংঘর্ষের পর কালীচরণের দল পশ্চাতে হঠিতে লাগিল। রহিমের লাঠির অব্যর্থ আঘাতে কয়েকজন পাইক আহত হইল। রহিমের ইচ্ছা ছিল না যে, তাহারই হাতেগড়া সাক্‌রেদগণ তাহারই হস্তে লাঞ্ছিত হয়। কিন্তু সংঘর্ষের সময় ত দয়া করা চলে না। ক্রমেই বিরুদ্ধপক্ষের আহতের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, তখন সে হাঁকিয়া বলিল, "কালীসর্দ্দার, আজ তোমায় আমায় বোঝা পড়া হোক্। তোমার ও আমার মধ্যে যে জিত্‌বে, চর তার হবে। বাকী সব দূরে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখুক। কেমন রাজি?"

কালীসর্দ্দার গর্জ্জন করিয়া বলিল, "বেশ!"

চক্রাকারে লাঠি চালনা করিতে করিতে রহিম সর্দ্দার সকলকে দূরে সরিয়া যাইতে আদেশ করিল। যুধ্যমান লাঠিয়ালগণ তাহার আদেশে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া, নীরবে দুই প্রসিদ্ধ সর্দ্দারের লাঠি-চালনার কৌশল দেখিতে লাগিল।

উভয়ে উভয়কে প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমণ করিল। লাঠিচালনায় কেহই ন্যূন নহে। মণ্ডলাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। লাঠিতে লাঠিতে ঠেকিয়া ভীষণ শব্দ উঠিতে লাগিল। লাঠি ঘুরিতেছে, কি চক্র চলিতেছে, তাহা দর্শকদিগের পক্ষে নির্ণয় করা কঠিন। যে কখনও বাঙ্গালী লাঠিয়ালের ক্রীড়া-কৌশল না দেখিয়াছে, সে কিছুতেই উহা অনুমান করিতে পারিবে না। বাঙ্গালার লাঠি একদিন কি অসাধ্য সাধনই না করিত!

কালীসর্দ্দার ক্রমে বুঝিল যে, রহিম তাহাকে ক্রমশঃই জলের ধারে হঠাইয়া লইয়া চলিয়াছে। প্রভাতের রৌদ্র তাহার মুখের উপর পড়ায় সে অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করিতে লাগিল। সে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনও মতে আপনার অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারিল না।

রহিম তাহার অবস্থা বুঝিয়া আরও প্রচণ্ডবেগে তাহাকে আক্রমণ করিল। সে আক্রমণ-বেগ সংবরণ করিতে গিয়া কালীসর্দ্দারকে জলে নামিতে হইল।

জলে দাঁড়াইয়া প্রবল প্রতিযোগীর সহিত যুদ্ধ করা অসম্ভব। কালীসর্দ্দার সে কথা বুঝিল, কিন্তু তথাপি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল না।

একহাঁটু জলে দাঁড়াইয়া তখনও সে রহিমের প্রচণ্ড আঘাত প্রতিরোধ করিতেছিল। সেরূপ প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়াও কালীচরণ যেরূপে আত্মরক্ষা করিতেছিল, অভিজ্ঞ লাঠিয়ালগণ তাহাতে তাহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে না; কিন্তু পরিণামে যে তাহাকে হারিতে হইবে, তাহাও সকলে বুঝিতে পারিল।

রহিম হাঁকিয়া বলিল, "সর্দ্দার-পো, আর কেন? এখনও পিঠ দেখাও।"

দাঁতে দাঁতে চাপিয়া সগর্জ্জনে বলিল, "প্রাণ গেলেও নয়।"

লাঠিখেলার নিয়মই এই যে, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলে তাহাকে কেহ আঘাত করিবে না। বিংশশতাব্দীতেও বাঙ্গালার লাঠিয়ালগণ এই নীতি বিসর্জ্জন করিতে শিখে নাই।

রহিম সর্দ্দার তখন প্রতিযোগীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া লাঠি উঠাইয়া বলিল, "তবে মর।"

দুর্ভাগ্যবশতঃ কালীচরণ সে আঘাত নিবারণ করিতে পারিল না। বিদীর্ণ মস্তকে সে জলের মধ্যে ঢলিয়া পড়িল। রক্তধারায় সেই স্থলের নদীর জল রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

সিংহ-বিক্রমে রহিমের দল চর দখল করিল।

জয়োল্লাসে মুকুন্দপুরের পাইকগণ এমন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে, বিরুদ্ধপক্ষ সেই অবকাশে কখন্ কালীসর্দ্দারের মৃতদেহ সরাইয়া ফেলিয়াছিল, কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই।

যখন সেদিকে সকলের দৃষ্টি পড়িল, তখন লাশ অন্তর্হিত হইয়াছে।

রহিম সর্দ্দার ততক্ষণ প্রতিশ্রুত পুরস্কার আদায় করিয়া ফুফুর বাড়ীতে শাল-জোড়া রাখিয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। সে এ সংবাদ রাখেও নাই, প্রয়োজনও অনুভব করে নাই। সে জানিত, মুকুন্দপুরের জমীদারবাবুদের লোকজন এ সকল ব্যবস্থা করিবেন।

(৩)

মনিবের কাজ সারিয়া, সমস্ত রাত্রি ও দিন রামনগরের দোল উপলক্ষে যাত্রা শুনিবার পর, তৎপরদিবস সন্ধ্যার সময় সে যখন ভিন্নপথে তাহার ফুফুর বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি প্রায় ছয়দণ্ড হইয়া গিয়াছে। মনিবের কাছে কোন জবাব লইয়া যাইবার প্রয়োজন ছিল না বলিয়াই, রহিম দুইদিন একটু স্ফূর্ত্তি করিবার অবকাশ পাইয়াছিল। বিশেষতঃ নগদ পঞ্চাশ মুদ্রা তাহার হস্তগত।

দুই তিন পাত্র সফেন তালরস পান করিয়া মন ও শরীর তাহার খুবই তাজা হইয়াছিল। কিন্তু ফুফুর বিষণ্ণ ও ভয়চকিত-মূর্ত্তি দেখিয়া অকস্মাৎ তাহার মনটা দমিয়া গেল।

নাজির শেখ তাহাকে একান্তে ডাকিয়া বলিল, "বাপজান্, সর্ব্বনাশ হয়েছে। পুলিশ এসেছিল তোর সন্ধান নিতে। কালীসর্দ্দারকে খুন করেছিস্ ব'লে পুলিশ থেকে তোর নামে হুলিয়া বেরিয়েছে। সন্ধ্যের একটু আগে তারা বিষ্ণুপুরের দিকে গেছে। আমি তবু কিছু বলিনি।"

রহিম সর্দ্দারের স্ফূর্ত্তি যেন বাতাসে মিশাইয়া গেল। সামান্য যে একটু মত্ততা আসিয়াছিল, তাহা কোথায় চলিয়া গেল। সে নিমেষ মধ্যে বুঝিয়া লইল, বাবুদের বুদ্ধির দোষে লাশটা বিরুদ্ধপক্ষ দখল করিয়াছে। মুকুন্দপুরের

পক্ষ হইতে ঐ লাশ যদি সনাক্ত করা হইত, তবে তাহার কোন বিপদের আশঙ্কাই ছিল না। এখন তাহারই সমূহ বিপদ!

সমস্ত দিন সে একরূপ অভুক্তই ছিল। ক্ষুধাও খুব পাইয়াছিল। কিন্তু এই নিদারুণ সংবাদে তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা অন্তর্হিত হইল। কি কর্ত্তব্য,তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, সে কয়েক মুহূর্ত্ত গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

ফুফুর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া সে যৎসামান্য কিছু খাইয়া লইল।

না—আর একমুহূর্ত্তও বিলম্ব করা উচিত নহে। এখানে থাকিলেই এখনই পুলিশ আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে।

কিন্তু যাইবে কোথায়? গৃহে? সেখানে ত পুলিশ আগেই হানা দিবে।

বাড়ীর কথা ভাবিতেই, তাহার মাতা ও নবীনা পত্নীর কথা মনে পড়িল। বাড়ীতে বৃদ্ধ মাতা ও পত্নী মেহের। সে শালজোড়া লইয়া গিয়া মাতা ও পত্নীকে উপহার দিবে বলিয়া মনে কত আশাই করিয়াছিল, এখন?—

রহিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। ভাবিল, খোদা যাহা করিবেন, তাহার উপর কাহারও হাত নাই ত!

বাহিরে পত্রের মর্ম্মর শব্দ শুনিয়া রহিম চমকিয়া উঠিল। তার পর উৎকর্ণ হইয়া শুনিবার পর সে ফুফুকে ডাকিয়া কি বলিল।

লাঠিখানা বাগাইয়া ধরিয়া রহিম ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল; তার পর গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

(৪)

সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিয়া বৃদ্ধ জমীদার মহেশ রায় বাহিরের রকে পাদচারণা করিতেছিলেন। আজ তাঁহার মনটা ভাল ছিল না। রহিম সর্দ্দার যে কাণ্ডটা বাধাইয়া বসিয়াছে, তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। আজ সকালে পুলিশ তাঁহার কাছে রহিমের সন্ধান জানিবার জন্য আসিয়াছিল।

বৃদ্ধ রায়-মহাশয়ের পরিক্রমণ আর শেষ হয় না। সহসা অন্ধকারে দীর্ঘাকার মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি বলিলেন "ও কে?"

অবনত দেহে অভিবাদন করিয়া আগন্তুক অপরাধ-ক্ষুণ্ণ-কণ্ঠে বলিল, "আজ্ঞে হুজুর, আমি রহিম।"

"রহিম? তুই কোথায় ছিলি?"

"আজ্ঞে কর্ত্তা, সারাদিন জঙ্গলে জঙ্গলে ছিলাম।"

সে ভাবিয়াছিল, মনিব তাহাকে কোন মতেই ক্ষমা করিবেন না। কিন্তু বৃদ্ধ রায়মহাশয় যখন ভৃত্য হরিচরণকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে, বাড়ীর ভেতর থেকে রহিমকে শীঘ্র কিছু খাবার এনে দে," তখন সে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সে জানিত, পুলিশ এখনও তাহার বাড়ীর চারি-পার্শ্বে পাহারা রাখিয়াছে, সেখানে গিয়া মাতা ও পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করা অসম্ভব। সংবাদ পাইলে পুলিশ এখনই তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইবে, এই আশঙ্কা এতক্ষণ ছিল; কিন্তু মনিবের কাছে যখন সে আসিতে পারিয়াছে, তখন সে স্বয়ং যমকেও ভয় করে না। সে জানিত, তাহার প্রভু জীবনে কোনও আশ্রিতকে পরিত্যাগ করেন নাই। মহেশ রায় অসাধ্য সাধন করিতে পারেন, তাহাও তাহার অগোচর ছিল না।

মনিবের নিকট আশ্বাস-লাভের ইঙ্গিত পাইয়া রহিম নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিল। মহেশ রায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার আহার দেখিতে লাগিলেন।

রায়মহাশয় গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "হাঙ্গামা বাধালি যদি রহিম, তবে লাশটাকে নিজেদের কাছে না রেখে, শত্রুর হাতে দিয়ে এলি?"

রহিম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ঐটুকু কসুর হয়ে গেছে, হুজুর। আমি কি জান্‌তাম্ কর্ত্তা যে, মুকুন্দপুরের লোকগুলা সব এমন গাধা! আপনার পেরসাদে কত হাঙ্গামা ত করেছি হুজুর, কিন্তু এমন কাঁচা কাজ কখন হয় নি।"

"যাক্, যা হবার তা হয়ে গেছে। আজ এখনই তুই রঙ্গপুরের কাছারিতে চলে যা। আমি নায়েবকে সব লিখে দিচ্ছি। সেখানেও লুকিয়ে থাক্‌বি। আমার হুকুম না পেলে, খবরদার সেখান থেকে বেরুবি না। এ অঞ্চলে এখন কিছুদিন আস্‌তে পাবি না।"

জমীদারের লিখন লইয়া রহিমসর্দ্দার সেই রাত্রিতেই গ্রাম ত্যাগ করিল।

(৫)

মহেশ রায়কে সে জেলার ইতর ভদ্র সকলেই বিলক্ষণ চিনিত। অমন সদাশয়, অমন অমায়িক, অমন মুক্তহস্ত এবং দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জমীদার সে অঞ্চলে আর কেহ ছিল না। অর্থে তাহার অপেক্ষা অনেকেই হয়ত প্রবল ছিলেন; কিন্তু এত বড় বুকের পাটা লইয়া আর কেহ তাঁহার

সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেন না। অন্যের পক্ষে যাহা অসাধ্য, মহেশ রায় তাহা অবহেলায় সুসম্পূর্ণ করিতে পারিতেন। দরিদ্র ও বিপন্নের তিনি বন্ধু ছিলেন। পরের বিপদ নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া তিনি কত লোককেই যে বিপন্মুক্ত করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। আহার ব্যতীত আর কোনও বিষয়ে তাঁহার বিলাসিতা ছিল না। সামান্য একটা মেরজাই ও সাদা চাদর এবং চটিজুতা, ইহাতেই তাহার নবাবী চরিতার্থ হইত।

রহিম সর্দ্দারকে তিনি প্রাণ ভরিয়া স্নেহ করিতেন। তাকে খুনী মোকদ্দমার দায় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি নানাপ্রকার কৌশল করিতেছিলেন, কিন্তু কোন মতেই সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই।

প্রধান সাক্ষী কালীসর্দ্দারের শোকাতুরা মাতা। সে কোনমতেই পুত্র-হন্তাকে ক্ষমা করিতে রাজি হয় নাই। কূটবুদ্ধিজীবী মহেশ রায় তখনও পর্য্যন্ত তাহাকে বাগাইতে পারেন নাই।

শ্রাবণ মাস। অবিশ্রান্ত বর্ষণে গ্রাম ও প্রান্তর জলে ডুবিয়া গিয়াছে। সেদিন সন্ধ্যার সময় বর্ষণ থামিয়াছিল বটে; কিন্তু আকাশ মেঘমেদুর।

সেরেস্তায় বসিয়া রায়-মহাশয় হিসাবপত্র দেখিতেছিলেন। সম্মুখে স্তূপীকৃত খাতাপত্র। আশেপাশে মুহুরী গোমস্তা বসিয়া, যে যাহার কাজে ব্যস্ত।

রায়মহাশয় আলবোলার নলটি পার্শ্বে রাখিয়া বাহিরের আকাশের দিকে চাহিলেন। ঘন-মেঘের কালো ছায়া সমস্ত আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। রাত্রিতে প্রবল বর্ষণ হইবার সম্ভাবনা।

তিনি পুনরায় কাগজপত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে যাইতেছেন, সহসা দ্বারপথে দীর্ঘাকার মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন।

"কে তুমি?"

"আজ্ঞে হুজুর, আমি।"

"তুই? তুই এখানে এলি কেন? আমি বারণ করেছিলুম। কি পাগল!"

"আজ্ঞে কর্ত্তা—

রায়-মহাশয় সেরেস্তা ছাড়িয়া উঠিলেন। কর্ম্মচারীরা বিস্মিতভাবে ফেরারী আসামী রহিম সেখের দিকে চাহিয়া রহিল। সকলেই জানিত, তাহার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে। পুলিশ সর্ব্বদাই তাহার সন্ধানে ফিরিতেছে। আজও সকালে পুলিশ তাহার অনুসন্ধানে আসিয়াছিল। রহিম সেখ গ্রামে

ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। এ অবস্থায় রহিম সর্দ্দারের দুঃসাহস দেখিয়া কর্ম্মচারীরাও হতবুদ্ধি হইয়া রহিল।

জমীদার-মহাশয় রহিমকে অন্যকক্ষে ডাকিয়া লইলেন। তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও সে গুপ্তস্থল হইতে বাহির হইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া, তিনি তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন এবং এখনই—এই দণ্ডেই তাহাকে গ্রাম ত্যাগ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। চারিদিকে পুলিশের চর আছে; সে গ্রামে আসিয়াছে এ সংবাদ পুলিশের জানিতে বিলম্ব হইবে না। এ অবস্থায় সে যদি ধরা পড়ে, তবে তাহাকে রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইবে।

রহিমের মুখের দিকে চাহিয়াই, লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ রায়মহাশয় বুঝিয়াছিলেন, কেন সে গ্রামে আসিয়াছে। তিনি অবিচলিত কণ্ঠে বলিলেন, "দিন-কতক আরও চুপ করিয়া থাক্। বাড়ীর ভাবনা মনথেকে তাড়িয়ে দে। সে সব বন্দোবস্ত আমি ক'রে দিয়েছি। আজ এখনই চলে যা। কিছু টাকাও নিয়ে যা।"

প্রভুর আদেশে রহিমসর্দ্দার তখনই নতমস্তকে জমীদার-বাটী ত্যাগ করিল।

(৬)

কিন্তু প্রলোভন সে সংবরণ করিতে পারিল না। এই রাত্রির ঘনান্ধকারে কে তাহার সন্ধান পাইবে? শুধু রাত্রির এই কয়ঘণ্টা মাত্র বই ত নয়? সে চুপি চুপি একবার বাড়ীতে যাইবে। দীর্ঘ ছয় মাস সে বাড়ীছাড়া। বৃদ্ধমাতা তাহার শোকে কতই না কাঁদিতেছে। সেই ত তাহার একমাত্র স্নেহের বন্ধন। তার পর মেহের—আহা বেচারার প্রাণে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা কত যন্ত্রণাই না দিতেছে! মেহেরের জন্য তাহার বিশাল বক্ষের অভ্যন্তরে কতখানি প্রেম সঞ্চিত ছিল, ছয় মাসের অদর্শনে সে কি মর্ম্মে মর্ম্মে তাহা অনুভব করে নাই? তাহার শিরের উপর কত বড় বিপদের বোঝা ঝুলিতেছে, তাহা ত সে ভাল করিয়াই জানে। পুলিশ তাহাকে ধরিবার জন্য কিরূপ ব্যগ্র, তাহাও ত তাহার অগোচর নাই। তথাপি সে সকল বিপদকে উপেক্ষা করিয়াই, সে গ্রামে আসিয়াছে কেন?

আর সে বুড়া মা ও স্নেহময়ী পত্নীকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেছে না বলিয়াই, সে এত বড় দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছে। মনিবের কঠোর

আদেশ সে শুনিয়াছে। তাহাকে গ্রাম ত্যাগ করিতেই হইবে, নহিলে তিনি কোন মতেই মার্জ্জনা করিবেন না। অমন স্নেহময়, করুণাময় প্রভু সে কোথায় পাইবে? তাঁহার আদেশ দুর্লঙ্ঘ্য।

কিন্তু তথাপি তাহার চরণ-দুখানি তাহাকে সেই অন্ধকারের মধ্যেই, গ্রামপ্রান্তস্থিত বাড়ীর দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। সে মনে মনে ভাবিল, মাতা ও পত্নীর সহিত দেখা করিয়াই সে গ্রাম পরিত্যাগ করিবে। কাক-পক্ষীও তাহার আগমন ও প্রস্থানের সংবাদ জানিতে পারিবে না। এই দুর্য্যোগে পুলিশ তাহার সন্ধানে আসিবে না। জানিবে কেমন করিয়া?

বাড়ীর কাছে আসিয়া রহিম দেখিল, বর্ষার জলে তাহার বাড়ীখানি দ্বীপের মত ভাসিতেছে। প্রতিবৎসরেই চতুষ্পার্শ্বস্থ জমী এই রূপেই জলে ডুবিয়া যায়। এবারকার প্রবল বর্ষায় জলের গভীরতা আরও বাড়িয়াছে।

ঘনান্ধকারের মধ্যে দীর্ঘ গাছপালাগুলি দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া আছে। জোনাকীর দীপ্তি, ভেকের মক্ মক্ ধ্বনি এবং ঝিল্লীর শব্দ রহিমকে কয়েক মুহূর্ত্ত জলের ধারে স্তব্ধ করিয়া রাখিল। তার পর পরিধানের বস্ত্রখণ্ড, গায়ের মেরজাই ও চাদর কসিয়া বাঁধিয়া যষ্টিখানি লইয়া সে জলের মধ্যে অবতরণ করিল। সন্তরণ ব্যতীত বাড়ীতে পঁহুছিবার আর কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

অতি নিঃশব্দে সে জলরাশি ভেদ করিয়া বাড়ীর অভিমুখে চলিল।

বাড়ীর চারিপার্শ্বস্থ সামান্য জমী জলের উপর জাগিয়াছিল। রহিম উপরে উঠিয়া কাপড় পরিল। তার পর মৃদুস্বরে রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিল, "মা"।

ভিতর হইতে শঙ্কিত কণ্ঠে কেহ বলিল, "কে?"

নিম্নস্বরে বলিল, "চুপ, আস্তে কথা কও, আমি রহিম।"

ব্যগ্র হস্তে রুদ্ধ অর্গল মুক্ত হইল।

শোকাতুরা মাতা পলাতক জোয়ান পুত্রকে বক্ষে ধরিয়া অশ্রুর উৎস খুলিয়া দিল। ঘরের অপর পার্শ্বে অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনাবৃতা যুবতী তৃষিত নেত্রে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল। তাহারও নয়নে মুক্তাবিন্দু দুলিতেছিল।

অল্প কথায় রহিম সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া দিল। ছয় মাসের অদর্শন-যন্ত্রণা সে কেমন করিয়া সহ্য করিয়া আসিয়াছে, তাহা সে প্রকাশ করিল না। স্নেহাতুরা রমণীদিগকে সেকথা বলিয়া ব্যাকুল করিয়া কোন লাভ নাই।

কিন্তু এখনই সে চলিয়া যাইবে শুনিয়া, মাতা অধীর হইয়া উঠিল।

তাঁহার স্নেহের দুলাল, অন্ধের লড়ি এতকাল পরে আসিল, কিছু না খাইয়াই চলিয়া যাইবে?

বৃদ্ধা কোনমতেই সে কথায় কান দিল না। আকাশে দুর্য্যোগ, অন্ধকার রাত্রি, কে তাহার সন্ধান লইতেছে? রাত্রিশেষে চলিয়া গেলেই হইবে।

পত্নীর তৃষিত নেত্রের দিকে চাহিয়া, মুগ্ধ রহিম সেই ব্যবস্থাই সঙ্গত মনে করিল।

(৭)

এই দুনিয়ায় সকলেই অর্থের সন্ধানে ফিরিতেছে। টাকার প্রলোভন দমন করা সহজ কথা নহে। রহিমের সন্ধান বলিয়া দিয়া তাহাকে ধরাইয়া দিতে পারিলে সরকার প্রচুর পুরস্কার দিবেন, সকলেই সে সংবাদ রাখিত। সুতরাং যথা সময়ে গোয়েন্দার মুখে পুলিশ তাহার গ্রামে আসা ও বাড়ীতে যাওয়ার সংবাদ পাইয়াছিল। কিন্তু রাত্রিতে জলভাঙ্গিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে যাওয়া সুবিধাজনক নহে ভাবিয়া, পুলিশ রাত্রিকালে তাহাকে নাড়া দিল না। দিনের বেলা বেড়াজাল ঘিরিয়া বৃহৎ মৎস্যটিকে ডাঙ্গায় তোলা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে, মনে করিল।

রাত্রিতে আসামী পলাইতে না পারে, এজন্য চারিদিকে পাহারা রাখিল। জলপার না হইলে ত রহিমের পলায়নের কোনও সম্ভাবনা নাই; সুতরাং চৌকীদার ও পুলিশ তাহার জলবেষ্টিত বাড়ীর চারিদিকে ঘাঁটি আগলাইয়া বসিয়া রহিল। রাত্রির বৃষ্টিতেও কেহ নড়িল না।

শেষরাত্রিতে রহিম শয্যাত্যাগ করিল। তখনও টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছিল। গৃহ ত্যাগ করিবার জন্য সর্দ্দার সাজসজ্জা করিয়া লইল। পূর্ব্ব আকাশে ঊষার ক্ষীণ আলোকের পূর্ব্বাভাস দেখিয়া আর কালবিলম্ব সঙ্গত নহে মনে করিয়া, রহিম সন্তর্পণে বাহিরে আসিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে সহসা সে অনুমান করিল, জলের ওপারে রাস্তার উপর যেন সন্তর্পণে মানুষ চলাফেরা করিতেছে।

তবে কি পুলিশ সন্ধান পাইয়াছে? রহিমের মন উদ্বেগে পূর্ণ হইল। অল্পক্ষণ পর্য্যবেক্ষণের পর সে বুঝিল, তাহার আশঙ্কা অমূলক নহে। অন্ততঃ ত্রিশ চল্লিশজন যষ্টিধারী পুলিশ তাহার বাড়ীর চারিদিকে পাহারা দিতেছে।

সে তাহার মাতা বা পত্নী কাহারও নিকট তাহার আশঙ্কার কথা ভাঙ্গিল না। রহিম বুঝিয়াছিল, জলে সাঁতার দিয়া ওপারে উঠিতে গেলেই তাহার রক্ষা নাই। সকলে মিলিয়া তাহাকে পিষিয়া ফেলিবে। কিন্তু বাড়ীতে বসিয়া থাকিলেও রক্ষা নাই। শত শত পুলিশ আসিয়া বাড়ী চড়াও হইলে, তখন ত উদ্ধারের কোনও উপায়ই থাকিবে না। এখনও অন্ধকার আছে বলিয়া পুলিশ তাহাকে আক্রমণ করিতে সাহস করিতেছে না। বেলা হইলে তাহাদের সে অসুবিধা থাকিবে না। সুতরাং আলোক উজ্জ্বল হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে বাড়ী ছাড়িয়া পলায়নের চেষ্টা করিতে হইবে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া সে বাড়ীর ছোট নৌকাখানা টানিয়া জলে ভাসাইল। তার পর মাথায় উত্তরীয়খানি দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া চিরসম্বল লাঠিখানা লইয়া নৌকা বাহিয়া চলিল।

পুলিশও ইতিপূর্ব্বে কয়েকখানি নৌকা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। রহিমের উদ্দেশ্য বুঝিয়া দুই খানি নৌকায় পুলিশ প্রহরীরা উঠিয়া দুইদিক হইতে রহিমকে আক্রমণ করিতে চলিল। নৌকায় চড়িয়া লাঠিখেলার কৌশল দেখান বড় সহজ ব্যাপার নহে। জমীর উপর হইলে রহিম সর্দ্দার ত্রিশ চল্লিশজন পুলিশকে গ্রাহ্যই করিত না। কিন্তু জলের উপর একা সে নৌকা বাহিবে, না আত্মরক্ষা করিবে?

গর্জ্জন করিয়া রহিম বলিল, "সাবধান, আমার কাছে এলে তার মাথা থাকবে না, এই বুঝে কাছে এসো।"

অসম-সাহসিক দুর্দ্দান্ত রহিম সর্দ্দারের লাঠির প্রতাপের কথা সকলেরই জানা ছিল; কিন্তু জলের উপর একা সে কি করিবে?

দুইখানি নৌকা দুই দিক হইতে তাহার উপর আসিয়া পড়িল। দশখানি লাঠি তাহার মাথার উপর উদ্যত হইল। আরও দুইখানি নৌকা দ্রুত বেগে তাহার দিকে অগ্রসর হইল।

রহিম প্রমাদ গণিল; কিন্তু হতাশ হইল না। অপূর্ব্ব কৌশলে সে দশখানি লাঠির আঘাত ফিরাইয়া দিয়া এমন ভাবে আক্রমণকারীদিগের উপর লাঠি চালাইল যে, আত্মরক্ষা করিতে গিয়া হুড়াহুড়ির ফলে একখানা নৌকা উল্টাইয়া গেল। লোকগুলি জলে পড়িয়া গেল। সেই অবকাশে রহিম ডাঙ্গার যে অংশে অপেক্ষাকৃত কম লোক ছিল, সেইদিকে দ্রুতবেগে নৌকা চালাইল। একবার জল হইতে ডাঙ্গায় উঠিলে আসামীকে গ্রেপ্তার করা কঠিন হইবে,

বুঝিয়া আক্রমণকারীর দল আরও দুইখানা নৌকা করিয়া দ্রুততরবেগে তাহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল।

রহিম বুঝিল, এ যাত্রা তাহার রক্ষা নাই। তখন সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইল। ধরা সে দিবে না।

ডাঙ্গায় তখন চারি পাঁচ জনের বেশী লোক ছিল না। সকলেই নৌকায় চড়িয়া তাহাকে ধরিতে আসিতেছে। ব্যাঘ্রবৎ এই দুর্দ্দান্ত লাঠিয়ালকে জলের উপর ছাড়া সহজে আয়ও করা সম্ভব নহে, তাহা আক্রমণকারীরা বেশ জানিত।

রহিম তখন প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া লাঠি চালাইতে চালাইতে নৌকা ডাঙ্গার দিকে লইয়া চলিল। দুইখানি নৌকা নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে, আর চারিখানি তীরবৎ ছুটিয়া আসিতেছে।

তীরের কাছে আসিয়া অল্পজল দেখিয়া রহিম প্রাণপণবেগে লাফাইয়া পড়িল। যাহারা ডাঙ্গায় ছিল, তাহারা ছুটিয়া আসিল। নৌকারোহীরাও তাহাকে কাবু করিবার জন্য লাঠি চালাইতে লাগিল।

লাঠির আঘাতে রহিমের কাঁধের একস্থল কাটিয়া রক্ত-স্রোত বহিতেছিল, সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। সে এখন ডাঙ্গায় উঠিয়াছে। অন্তিম-বলে সে আত্মরক্ষার জন্য লাঠি চালাইতে লাগিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে রক্তাক্ত-কলেবর রহিম সর্দ্দার মুক্তপক্ষ-বিহঙ্গের ন্যায় পথের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিল। আক্রমণকারীদিগের অধিকাংশই তখন আহত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে।

(৮)

জমীদার বাটীর প্রাঙ্গণে পঁহুছিয়াই রহিমের সংজ্ঞাশূন্যদেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। রায়-মহাশয় ঘরের মধ্য হইতে ছুটিয়া আসিলেন। একবার তাহার রক্তাক্ত-কলেবরের প্রতি চাহিয়াই ব্যাপারটা তিনি অনুমান করিয়া লইলেন।

তাঁহার আদেশে দেউড়ীর প্রকাণ্ড দরজা তখনই রুদ্ধ হইয়া গেল। তাঁহার বিনা-হুকুমে কেহ উহা খুলিবে না।

দুইজন ভৃত্যের সাহায্যে রায়-মহাশয় স্বয়ং সর্দ্দারের ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দিলেন। কয়েকটি কাছের পাতা মাড়িয়া তখনই উহাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেওয়া হইল।

রহিম সর্দ্দার একটু সুস্থ হইলে তখনই রায়-মহাশয় অন্তঃপুরস্থ পূজার ঘরের পার্শ্বস্থ কক্ষে উহাকে রাখিয়া স্বয়ং ঘরের চাবি বন্ধ করিয়া দিলেন।

দেউড়ীর দ্বার আবার মুক্ত হইল। অত্যল্পকাল পরে সদলবলে দারোগা সেখানে হাজির হইলেন।

জমীদারের আদেশানুযায়ী কর্ম্মচারীরা সকলেই বলিল যে, রহিম সেখানে নাই। দারোগা নিশ্চিত জানিতেন যে, সর্দ্দার জমীদারের বাটীতে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু এখনও বাহির হইতে পারে নাই।

রায়-মহাশয় বলিলেন, "আপনি ইচ্ছা করিলে আমার বাহির বাটী খুঁজিয়া দেখিতে পারেন।"

দারোগা অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু সে যে অন্তঃপুরে আশ্রয় পাইয়াছে; তাহাকে বাহিরে কোথায় পাইবেন! দারোগার সন্দেহ গেল না। তিনি থানায় ফিরিয়া গিয়া গোপনে সদরে জানাইলেন, জমীদার মহেশরায় আসামীকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাকে ওয়ারেণ্ট করিলে আসামীকে পাওয়া যাইবে।

প্রকাশ্যে এই মহাসম্ভ্রান্ত ও দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী জমীদারকে অসন্তুষ্ট করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না।

রায়-মহাশয় সেই দিনই রাত্রিকালে, আহত রহিমকে বিশ্বাসী লোকজন সহ নৌকাযোগে তাঁহার রঙ্গপুরের কাছারীতে পাঠাইয়া দিলেন।

(৯)

সে দিন ভাদ্রের মেঘ-ভাঙ্গা প্রভাত-রৌদ্র বড়ই মধুর দীপ্তি দিতেছিল। কয়েক দিন বর্ষণের পর রৌদ্রালোক পাইয়া প্রকৃতির সজল-মুখখানি হাসিয়া উঠিল। রায়-মহাশয় কাছারীঘরের বারান্দায় পাদচারণা করিতেছিলেন।

"হুজুর, পেন্নাম হই।"

রায় মহাশয় চাহিয়া দেখিলেন, সদরের পেয়াদা নটবর শিকদার। গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কে, নটবর? কি মনে ক'রে?"

"আজ্ঞে, একখানা ওয়ারেণ্ট আছে।"—পেয়াদা, হাকিমের স্বাক্ষরিত আদেশ-পত্র জমীদার-মহাশয়ের সম্মুখে ধরিল। রায় মহাশয় ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া বলিলেন, "তা' বেশ। কিন্তু রায় মহাশয় ত বাড়ী নেই!"

নটবর মহেশ রায়কে বিলক্ষণ চিনিত। সে একবার বিস্ময়-বিহ্বল-দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল।

রায়-মহাশয় সকৌতুকে তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তিনি আজ কয়দিন মফস্বলে বেরিয়েছেন। বাড়ীতে ত নাই।"

"আজ্ঞে—"

"হ্যাঁ, তিনি বাড়ী নেই। বুঝ্‌তে পার্‌ছো না?"

"বুঝেছি কর্ত্তা। তবে তাই বল্‌বো?"

"হ্যাঁ। যাবার সময় একবার নায়েবের সঙ্গে দেখা ক'রে যেও শিক্‌দার-পো।"

মহেশ রায় ধীরে ধীরে কাছারী ঘরের মধ্য দিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

পেয়াদা খানিক নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, কাগজখানি ভাঁজ করিয়া দপ্তরে বাঁধিয়া রাখিল।

সদরে ফিরিয়া যাইবার সময় নায়েবের সঙ্গে দেখা করিতে সে ভুলে নাই। কাছারী-ঘর হইতে বাহির হইবার সময় শিকদার-পোর হাস্যমণ্ডিত প্রফুল্ল মুখখানি যে দেখিয়াছিল এবং ভিতরের কথা যে জানিত, সেই বুঝিয়াছিল, এবার শিকদার-গৃহিণীর অঙ্গে একখানা সোনার গহনা উঠিবার সম্ভাবনা হইয়াছে।

(১০)

শরতের নির্ম্মল প্রভাতে গরীব-দুঃখীর মা-বাপ স্বয়ং মহেশ রায়কে বাড়ীর প্রাঙ্গণে আসিতে দেখিয়া, "কালীর"মা শশব্যস্তে ঘরের মধ্য হইতে বাহিরে আসিল। নকিপুরের জমীদার-বাবুদের প্রজা হইলেও কালীর মা, জমীদার মহেশ রায়েরও তালুকের কিছু জমী-জমা রাখিত। কালীসর্দ্দার নিহত হইবার পর হইতে তাহার শোকাতুরা মাতা রহিম সর্দ্দারকে ক্ষমা করিতে পারে নাই। লোকের দ্বারা ইতিপূর্ব্বে তাহাকে বাধ্য করিবার জন্য মহেশ রায় অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন।

লোক-চরিত্রে মহেশ রায়ের বেশ অভিজ্ঞতা ছিল। তাই তিনি এতদিন তাহার কাছে কোন প্রস্তাব করেন নাই। সময়ে মানুষের শোকের প্রভাব কমিয়া আসে, তাহা তিনি জানিতেন। বিশেষতঃ পুত্রের মৃত্যুর পর বৃদ্ধা, পুত্রবধূ ও নাবালক পৌত্রকে লইয়া দেনার দায়ে বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে, সে সংবাদও তিনি রাখিয়াছিলেন।

দেশ-প্রসিদ্ধ জমীদারকে তাহার বাটীর প্রাঙ্গণে আসিতে দেখিয়া বৃদ্ধা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। মহেশ রায় তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন। কথায় কথায় তাহার সুখ-দুঃখের সকল সংবাদ জানিয়া লইলেন।

"কালীর-মা, তোমার ছেলে আর ফিরিবে না।"

অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বৃদ্ধা বলিল, "না, বাবা! সে গিয়ে যে আমার বুকে কি শেল বিঁধেছে, তা আর বল্‌বার নয়।"

"আচ্ছা, কালীর-মা, রহিম যদি ফাঁসী যায়, তাতে কি কালীচরণকে ফিরে পাবে?"

বৃদ্ধার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে বলিল, "না, তা পাবনা; তবে আমার মনে খানিকটা শান্তি আস্‌বে হুজুর!"

মহেশ রায় গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কিন্তু রহিমের মা, তখন তোমার মতই বুক্ চাপড়ে কাঁদ্‌তে থাক্‌বে। তার স্ত্রীও বিধবা হবে। তাদের দীর্ঘশ্বাস তোমার গায় লাগ্‌বে না বাছা? তাতে কি তোমার সুখ হবে?"

বৃদ্ধা কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া সুচতুর জমীদার বলিলেন, "তুমি হিন্দুর মেয়ে, পরের দুঃখে তখন তোমারও প্রাণ ফেটে যাবে। তোমার কালী ফির্‌বে না যখন, তখন আর একজনের বুকে এত বড় বাজ যাতে না পড়ে, বাছা, তা করা কি তোমার উচিত নয়?"

বৃদ্ধা চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল। রহিম মরিলে সত্যই ত তাহার কালী ফিরিবে না। তবে পুত্র-হন্তার প্রতিশোধ লওয়া হয় বটে! কিন্তু—

মহেশ রায় বলিলেন, "রহিম ইচ্ছে ক'রে কালীচরণকে মারে নি। দাঙ্গার সময় যদি রহিম বেকায়দায় পড়্‌তো, তবে কালীচরণই হয় ত রহিমকে খুন্ কর্‌তো। এতে রহিমের উপর ততটা দোষ দেওয়া যায় কি, কালীর মা?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধা বলিল, "আমায় কি কর্‌তে বলেন হুজুর?"

"সে পরে বল্‌বো। তুমি যদি আমার কথামত চল।—আচ্ছা, আমার কয় বিঘা জমী তোমার দখলে আছে, কালীর-মা?"

"দুই বিঘে হবে, তারও খাজনা দু'বছর দিতে পারিনি কর্ত্তামশাই।"

"আচ্ছা বেশ। ঐ দুই বিঘা, আরও পাঁচ বিঘা জমী আমি তোমায় নিষ্কর ক'রে দেবো। আর যদি দরকার বোঝ, আমার বাড়ীর কাছে দু'বিঘে নাথেরাজ জমী তোমার বাড়ী করে থাক্‌বার জন্য পাবে। তোমার ঘর বাঁধ্‌তে দু'শ টাকার বেশী বোধ হয় লাগ্‌বে না, সে টাকা নায়েব তোমাকে দিবে। তোমার নাতিকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করে দিও। তার জন্য মাসে পাঁচটা ক'রে টাকা পাবে। আমার কথামত যদি চল' তবে এই সব পাবে। তা ছাড়া তোমার বাকী খাজনা মকুব ক'রে দেবো।"

বেদান্তের ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হয় বটে; কিন্তু হিন্দুস্থান-সম্পাদক কিসের দায়ে বেদান্ত লইয়া এমন ভাবে বাচালতা করিলেন?

পাঠক, বেদান্তের "ভিতরের কথার" নমুনা দেখিলেন, এইবার সহজিয়ার একটু পরিচয় লউন। সম্পাদকমহাশয় ইদানীং বাঙ্গালার লাটসাহেবের মুখে বেদান্তের কথা শুনিয়া মনে করিলেন "বোধ হয় লাটসাহেবের দেশে অর্থাৎ পশ্চিমে—বেদান্তের অনুশীলন হইয়াছে—তাহাই হউক। এই সুযোগে আমরা—অন্ততঃ বাঙ্গালীরা পশ্চিমের সহজবোধ্য ধর্ম্মের সাধনা করিতে পারিলে আমাদেরও মঙ্গল। সে ধর্ম্মটা কি? বলা বাহুল্য, এই পাশ্চাত্যের ধর্ম্ম বা "আমরা বুঝি সহজিয়া"র পঁচিশ লাইন ব্যাখ্যায় সাংসারিক ও দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা বলিতে গিয়া সম্পাদক কেবল অসংযত ভাবের পরিচয় দিয়াছেন এবং উপসংহারে বলিয়াছেন "কিন্তু এ বেদান্ত নয়।"

"বেদান্ত" ও "সহজিয়া" এই উভয়বিধ মতবাদের কি সাধনাঙ্গে, কি তত্ত্বাঙ্গে, যিনি গভীর ভাবে অজ্ঞ, তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করিবার জন্য আমি আলোচনায় অগ্রসর হই নাই। কেবল গভীর ক্ষোভ ও দুঃখের সহিত ভাবিতেছি, জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বভার স্কন্ধে লইয়া একজন সংবাদপত্র-সম্পাদক বটতলার সাহিত্যকে লজ্জা দিয়া এমন ভাবে 'ন্যাকামো' করিলেন কেন? বাঙ্গালার একজন সংবাদপত্রের সম্পাদক কি এ সংবাদও রাখেন না যে, বিগত শতাব্দীর শেষভাগে এই বাঙ্গালাদেশ হইতেই একজন শক্তিমান্ বেদান্তপ্রচারক উত্থিত হইয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন, "হে বন্ধুগণ! তোমাদের সহিত আমি শোণিতসম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তোমাদের জীবনমরণে আমার জীবনমরণ। আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহের জন্য বলিতেছি, আমাদের আবশ্যক—শক্তি, কেবল শক্তি। আর উপনিষৎসমূহ শক্তির বৃহৎ আকরস্বরূপ। উপনিষদ্ যে শক্তিসঞ্চার সমর্থ, তাহাতে উহা সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করিতে পারে। উহার দ্বারা সমগ্র জগৎকে পুনরুজ্জীবিত এবং শক্তি ও বীর্য্যশালী করিতে পারা যায়। সকল জাতির, সকল মতের, সকল সম্প্রদায়ের দুর্ব্বল, দুঃখী, পদদলিতগণকে উহা উচ্চরবে আহ্বান করিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া মুক্তিলাভ করিতে বলে। মুক্তি বা স্বাধীনতা **দৈহিক স্বাধীনতা, মানসিক স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা, ইহাই উপনিষদের মূলমন্ত্র**"

আজকালকার স্কুলের ছাত্রেরাও যাহা আগ্রহসহকারে পাঠ করিয়া থাকে

অন্ততঃ সম্পাদক মহাশয় স্বামী বিবেকানন্দের সেই "কর্ম্মজীবনে বেদান্ত" বক্তৃতা কয়েকটী পাঠ করিবেন। তাহা হইলে "সহজিয়া" বুঝিবার জন্য দৌড়িতে হইবে না। সম্পাদক মহাশয় "মজ্জাগত বেদান্ত ভুলিয়া" লাভ করিতে চাহিতেছেন, তাহা বেদান্ত না ভুলিলেও লাভ করিতে পারি আর যদি বলেন, "আধপেটা ডালভাত খাওয়ার চেয়ে পেট ভরিয়া কাট্‌লেট্‌ খাইতে পাইলে বেশ হয়", তাহা হইলে বেদান্তকে আক্র করিয়াও অন্য উপায়ে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। তবে যখন অধিকাংশ লোক আজ আধপেটা ডালভাত খাইতে পারিলেই বর্ত্তিয়া সে অবস্থায় সংবাদপত্র-সম্পাদকের পক্ষে চপ্‌ কাট্‌লেটের আব্দার কতটা সঙ্গত, তাহা বোধ হয় এখন তিনি নিজেই বুঝিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা সংবাদপত্র-সম্পাদক গণের মধ্যে শ্রদ্ধেয় পাঁচকড়ি নাম সর্ব্বাগ্রগণ্য। তাঁহার লিখনভঙ্গী, হাস্যরস অবতারণা করিবার অপূর্ব্ব কে প্রশংসনীয় এবং পাণ্ডিত্য ও সর্ব্বজনবিদিত। বাঙ্গালার শিক্ষানবিশ সম্প গণ যে তাহার আদর্শ অনুকরণ করিতে যাইবেন, তাহা অসঙ্গতও কিন্তু অনুকরণ করিতে গিয়া নাকাল হওয়াটা কোনও সম্পাদকের শ্লাঘার কথা নয়। তাল ও মাত্রা বজায় রাখিয়া চলিতে পারিলে, কা ক্ষোভের কারণ জন্মে না। দেশের দারিদ্র্য ও অন্নবস্ত্রের সমস্যা ব্যঙ্গ করিতে যাওয়া, স্বদেশবাসী কাহারও পক্ষে গৌরবের বিষয় কথাটা একজন সংবাপত্র-সম্পাদককে যদি স্মরণ করাইয়া দিতে হয়, তদপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি থাকিতে পারে?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

৬৮।৫, রসারোড নর্থ, কলিকাতা
"রায় চৌধুরী" এণ্ড কোং হইতে
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
১৪।এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা
"মানসী" প্রেস হইতে
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

BLOCKED INFORMATION.